প্রাথমিক
বিজ্ঞান

Approved by the Board of Secondary Education, West Bengal, as a Text-Book for Class VI. Vide Notification No. Syl. 79/54 dated 27th December, 1954, and Calcutta Gazette dated 20th January, 1955.

প্রাথমিক বিজ্ঞান

প্রথম ভাগ

(ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য)

ডক্টর রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়
ডি. এস-সি., ডি. আই. সি. (লণ্ডন)

সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ

বাণী-বিহার
৮০।৬, গ্রে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিজ্ঞান

মানুষের দেহের শক্তি কম। বুদ্ধি খাটাইয়া সে বেশী শক্তি পায়। হাতী, ঘোড়া, গরু, মহিষ, সিংহ, বাঘ, ভালুক সব জন্তুর চাইতে মানুষের দেহের শক্তি অনেক কম। অথচ মানুষ হাতীকে পোষ মানাইল। তাহাকে দিয়া কাজ করাইল। ঘোড়াকে বশে আনিল। ঘোড়ার পিঠে চড়িল, গাড়ী টানাইল। গরু-মহিষের দুধ দোহন করিয়া লইল। বলদ দিয়া লাঙ্গল টানাইল। সিংহ, বাঘ, ভালুক
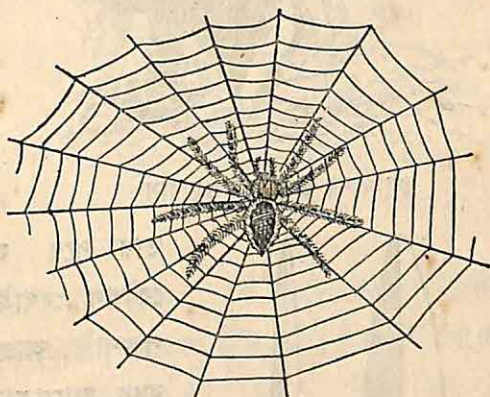
মাকড়সার জাল
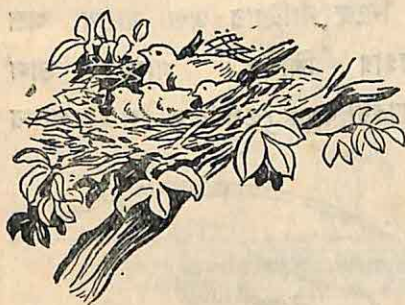
প্রভৃতি হিংস্র জন্তুকে খাঁচায় পুরিল। এ সবই মানুষ করিল বুদ্ধির কৌশলে। জ্ঞানই হইল সত্যকার শক্তি। বুদ্ধি আর বিচার-শক্তির জন্য মানুষ অন্যান্য জন্তুর চাইতে বেশী উন্নত হইয়া গেল।

পাখীর বাসা

মাকড়সা আজও জাল বোনে। পাখী আজও বাসা বাঁধে। মানুষ

যে-কালে গুহায় বাস করিত, সেকালেও তাহারা বাসা বাঁধিত। মানুষ

গুহামানব ও তাহার গুহাবাস

আধুনিক গৃহ
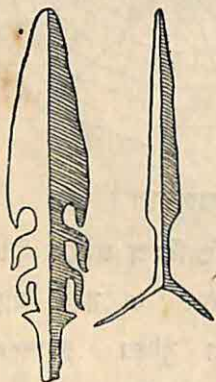
তার পরে কত রকম গৃহনির্মাণের কৌশল দেখাইল তাহার ঠিক নাই। পশুপাখী আজও সেই হাজার হাজার বছর আগেকার মতই একই ভাবে বাস করিতে অভ্যস্ত রহিয়া গেল।

নিজে বাঁচিবার জন্য মানুষ অস্ত্র ব্যবহার শিখিল। গাছের ডাল বাঁকাইয়া ধনুক তৈয়ারি করিল। পাথর
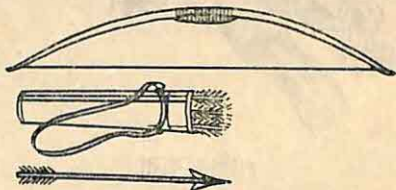
প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র

চোখা করিয়া অস্ত্র তৈয়ার করিল। পাথর ঘষিয়া আগুন জ্বালিল। আগুন সৃষ্টি যেদিন হইল সেদিন হইতে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা স্থরু লইল।

আগুনের আবিষ্কার

মানুষ ধীরে ধীরে কত বুদ্ধির কৌশল দেখাইল। এক দেশের রাজা বলিলেন, আমার ত এতগুলি হাতী আছে, কোন্‌টা সব চেয়ে ভারী ওজন করিয়া দাও! মন্ত্রীর ত মাথায় হাত! খেয়ালী রাজা বলেন কি? একজন বলিলেন, আচ্ছা আমি ওজন করিয়া দিতেছি। তিনি হাতীকে লইয়া একটা মালবাহী বড় নৌকায় তুলিলেন। হাতীর ভারে

হাতীকে মালবাহী নৌকায় তুলিলেন

নৌকা জলে অনেকখানি নামিয়া গেল। নামিয়া গিয়া যেখানে দাঁড়াইল,

সেখানে তিনি একটা দাগ কাটিয়া রাখিলেন। তারপর হাতীকে নামাইয়া নৌকায় মাল বোঝাই করিলেন যতক্ষণ না নৌকা সেই দাগ অবধি নামিল। এইবার কত মণ মাল বোঝাই করিলেন একটা দাঁড়িপাল্লায় তাহা ওজন করিয়া লইলেন। মালের ওজন হইল হাতীর ওজন।

বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঃ ইহার চেয়ে আরও বড় কৌশল মানুষ দেখাইল। আর এক দেশের রাজা একটা সোনার মুকুট তৈয়ারি করাইলেন। মুকুটটি রাজার খুব পছন্দ হইল। কিন্তু তাঁহার সন্দেহ হইল স্যাকরা সোনার সঙ্গে খাদ মিশাইয়াছে। মুকুট ওজন করাইলেন। ওজন ঠিকই আছে। কিন্তু সোনার সঙ্গে রূপা মিশাইয়া যদি ওজন ঠিক রাখিয়া থাকে। বিজ্ঞানীর ডাক পড়িল।

বিজ্ঞানী দুইখানি সমান আয়তনের চাকতি তৈয়ারি করিলেন। একটি সোনার, আর একটি রূপার। ওজন করিয়া দেখিলেন, সোনার চাকতি রূপার চাকতির দ্বিগুণ ভারি। যদিও তাহাদের আয়তন এক। বিজ্ঞানী ভাবিলেন, মুকুটটাকে তাপ দিয়া গলাইয়া যদি চাকতি বানান যায়, আর ঠিক সেই আয়তনের যদি খাঁটি সোনার চাকতি বানাই তাহা হইলে মুকুটটা খাঁটি সোনা দিয়া গড়া হইলে চাকতি দুইটির ওজন এক হইবে। নতুবা তফাৎ হইবে। কিন্তু মুকুট ত গলান চলিবে না। রাজার হুকুম নাই। ভাবিতে লাগিলেন, না গলাইয়া কি করিয়া মুকুটের আয়তন বাহির করিবেন। একদিন হইয়াছে কি, স্নান করিবেন বলিয়া যেই একটি জল ভর্তি টবে গা ডুবাইয়াছেন অমনি দেখিলেন জল উপচাইয়া পড়িল। ব্যস, বিজ্ঞানীর মাথায় বুদ্ধি খেলিয়া গেল। টব হইতে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, টবে আর জল কানায় কানায় ভরা নাই। তিনি ঠিক করিলেন তাঁহার দেহের যে আয়তন নিশ্চয়ই সেই আয়তনের জল উপচাইয়া টব হইতে পড়িয়া গেল।

তখন বিজ্ঞানী করিলেন কি একটি পাত্রে কানায় কানায় জল লইয়া তাহাতে সাবধানে মুকুটটিকে ছাড়িয়া দিলেন। খানিকটা জল উপচাইয়া পড়িয়া গেল। সেই জলের আয়তন তিনি মাপিলেন। সেইটা হইল মুকুটের আয়তন। এখন তিনি ঐ আয়তনের একটি খাঁটী সোনার চাকতি তৈয়ারি করিলেন। মুকুটটি খাঁটী সোনা দিয়া তৈয়ারী হইলে ওই চাকতির যাহা ওজন মুকুটেরও তাই ওজন হওয়া উচিত। তাহা কিন্তু হইল না। দেখা গেল, মুকুটের ওজন কম। ব্যস, বোঝা গেল, নিশ্চয়ই মুকুট খাঁটী সোনায় তৈয়ারি নয়। স্যাকরার তলব হইল। স্যাকরা দোষ স্বীকার করিল। রাজা ও সভাসদরা বিজ্ঞানীর জয়গান করিলেন। এই বিজ্ঞানীর নাম আর্কিমিডিস। ইনি জাতিতে গ্রীক।

আর্কিমিডিস
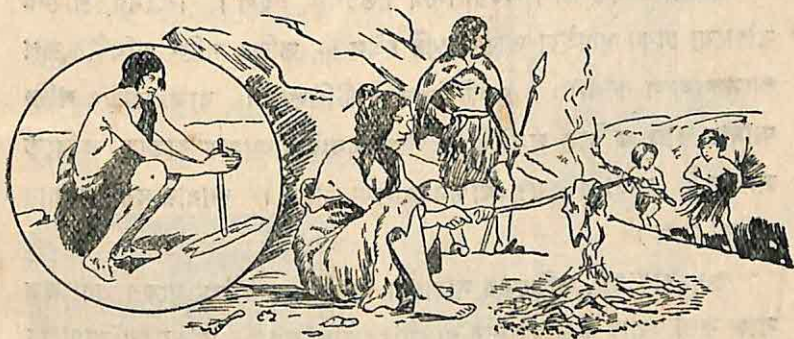
প্রাচীন মানবের আগুনের ব্যবহার

মানুষ আগুনের ব্যবহার শিখিল। চুলাতে হাপর দিয়া বেশী বায়ু প্রবেশ করাইয়া আগুনের উত্তাপ বাড়াইল। পাথর গলাইয়া ফেলিল।

তামা, ব্রঞ্জ, লোহা প্রভৃতি ধাতু তৈয়ারি করিল। তাহা হইতে ছোরা-ছুরি, তীরের ফলা, বল্লম, তরোয়াল তৈয়ারি করিল। হিংস্র জন্তুর আক্রমণ হইতে নিজেকে বাঁচাইল। অপর দলকে যুদ্ধে হারাইয়া নিজেদের দলকে সংসারে প্রতিষ্ঠা করিল। বিজ্ঞান অগ্রসর হইয়া চলিল।

মানুষ তাপের শক্তিকে কাজে লাগাইল। জলের চাইতে তপ্ত স্টিমে কাজ করিবার শক্তি বেশী বলিয়া জানিতে পারিল। স্টিম এঞ্জিন তৈয়ারি হইল। কয়লা পোড়াইয়া আগুন হইল, আগুনের সাহায্যে স্টিম তৈয়ারি হইল। এঞ্জিন চলিল, কারখানায় কাজ আরম্ভ হইল। শিল্প-বাণিজ্য গড়িয়া উঠিল।

তারপর মানুষ আবিষ্কার করিল পেট্রল। মোটর গাড়ী চালান সহজ হইল। যানবাহনের ব্যবস্থা সহজ হইল। উড়োজাহাজ সৃষ্টি হইল, পেট্রল উড়োজাহাজ চালাইল।

কয়লা হইতে তাপ লইয়া স্টিম তৈয়ারি হইল। স্টিমের শক্তির সাহায্যে চাকা ঘুরাইয়া তড়িৎ সৃষ্টি হইল। তড়িৎ শক্তি পৃথিবীর রূপ অনেক বদল করিল। একটি বোতাম টিপিলাম। ব্যস, তড়িৎ শক্তি আমার কাজ করিতে লাগিল। পাখা ঘুরাইয়া আমায় বাতাস করিতে লাগিল। রান্না করিবার আগুন জ্বলিয়া উঠিল। আঁধার ঘর আলোয় ভরিয়া গেল।

শুধু তাই নয়, তড়িতের সাহায্যে আবিষ্কার হইল দূরের লোকের সঙ্গে কথা বলার জন্য দূরভাষ বা টেলিফোন যন্ত্র। তড়িতের সাহায্যে 'টরে টক্কা' সংকেত করিয়া ডাকঘরের সাহায্যে দূরে সংবাদ পাঠাইবার ব্যবস্থা হইল। এক্স-রে আবিষ্কার হইল। ইহার সাহায্যে মানুষের দেহের ভিতরকার হাড়ের ছবি স্পষ্ট দেখা গেল। ডাক্তারেরা এই

আবিষ্কার অনেক কাজে লাগাইলেন। সন্দেহ হইল, শরীরের কোন

টেলিফোন
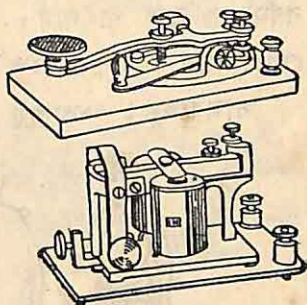
টেলিগ্রাফ

অংশের হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এক্স-রে ছবি তোলা হইল। হাড় ভাঙ্গিয়াছে, কি মচ্‌কাইয়াছে, কি আস্ত আছে স্পষ্ট বোঝা গেল।

তড়িৎ আবিষ্কারের ফলে আসিল রেডিও বা বিনা তারে খবর পাঠাইবার ব্যবস্থা। ঘরে বসিয়া ছোট
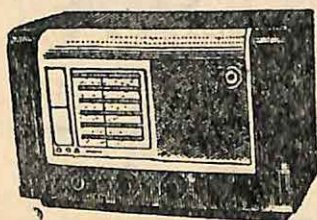
রেডিও
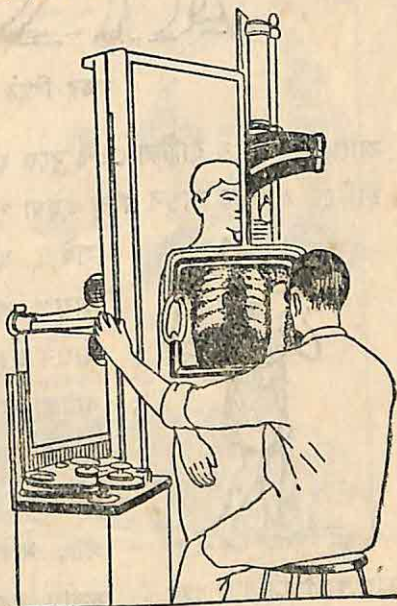
একস্‌-রে

একটি যন্ত্রের কাঁটা ঘোরাইলাম, অমনি ইংলণ্ডের ক্রিকেট খেলার বর্ণনা শুনিতে পাইলাম। দিল্লী হইতে গান শুনিতে চাই, কাঁটা ঘোরাইলাম, গান স্থরু হইল।

যানবাহনঃ ধরাপৃষ্ঠে চলাফেরা করার জন্য মানুষের পা
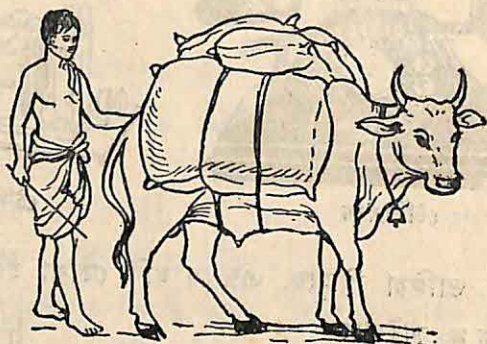
জন্তুর পিঠে মাল বহন

আছে। পায়ে হাঁটিয়া বেশী দূরে যাইতে গেলে অনেক সময় লাগে। হাঁটিতে হাঁটিতে মানুষ ক্লান্ত হইয়া পড়ে। জিনিসপত্রের বোঝা বহিয়া লইয়া যাইতে হইলে আরও কষ্ট হয়। অসুস্থ শরীরে হাঁটা চলে না। তখন মানুষ জন্তুর পিঠে চড়িয়া দূর দেশে যাইবার ব্যবস্থা করিল। আমাদের দেশে অনেক জায়গায় পাহাড় অঞ্চলে আজও লোকে ছাগলের পিঠে চড়ে। এই রকম গাধা, গরু, মহিষ, ঘোড়া, উট, হাতীর পিঠে চড়ার রেওয়াজ আজও আছে। রাজপুতানা অঞ্চলে আজও লোক উটের পিঠে চড়ে। একসঙ্গে অনেক দূর

মানুষের পিঠে মাল বহন

যাইতে হইলে আবার উট বা ঘোড়ায় চড়া চলে না। অনেক মালপত্র লইয়া পাঁচজনে একসঙ্গে জন্তুর পিঠে যাওয়া সম্ভব নয়। তখন মানুষ ব্যবহার করিল গাড়ীর। গরুর গাড়ী, মহিষের গাড়ী আমাদের দেশে আজও চলিতেছে। ঘোড়ায় টানা গাড়ী, ঘোড়ায় টানা রথ, এক্কা গাড়ী, টমটম, বোগি গাড়ী সবই ব্যবহার হইতে লাগিল। বরফের দেশে

গরুর গাড়ীতে মাল বহন

বল্গা হরিণে-টানা গাড়ী ব্যবহার হয়। কুকুরে-টানা গাড়ীও ব্যবহার
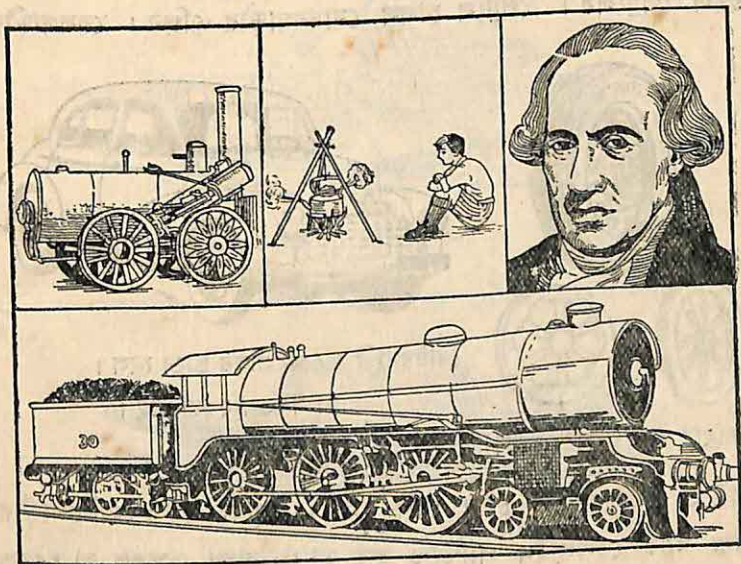
জেমস ওয়াট ও স্টিম এঞ্জিন

হয়। এমনিই অনেক দিন ধরিয়া চলিতেছিল। তারপর আসল

যন্ত্রের যুগ। জেমস ওয়াট স্টিম-এঞ্জিনের সূচনা করিলেন। স্টিফেনসন রেলগাড়ী চালাইলেন স্টিম-এঞ্জিন ব্যবহার করিয়া, ঘণ্টায় বার মাইল বেগে। ইহা হইল রেলগাড়ীর প্রথম সূচনা। আমাদের দেশে সাধারণতঃ ঘণ্টায় ত্রিশ হইতে চল্লিশ মাইল বেগে রেলগাড়ী চলে

স্টিফেনসন

রবার আবিষ্কার হইল। গাড়ীর চাকার উন্নতি হইতে লাগিল। গরুর গাড়ীর চাকা হইল কাঠের। রেলগাড়ীর লোহার আর মোটরগাড়ীর রবারের ফোলান টায়ারের। ইহার উপর আবিষ্কার হইল পেট্রলের। পেট্রলে চলিল মোটরগাড়ীর এঞ্জিন। রেলগাড়ীর
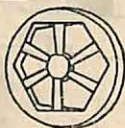
লোহার আর রবারের চাকা
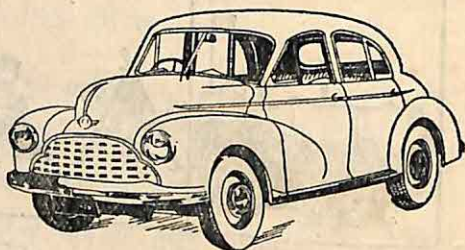
মোটরগাড়ী : রেল লাইন ছাড়া চলে।
রাস্তা সমতল হওয়া চাই।

চাইতে মোটরগাড়ীর চলন বেশী হইল। সুবিধা হইল মোটরগাড়ীর জন্য আর রেললাইন পাতিতে হয় না। রাস্তা সমতল না হইলে মোটরগাড়ী ভাল চলে না। গত মহাযুদ্ধে যে সব বড় বড় 'ট্যাঙ্ক' ব্যবহার হইয়াছিল সেগুলি কিন্তু যেমন তেমন রাস্তায়

চলিতে পারে। ছোটখাটো পাহাড়ের উপরও উঠিতে পারে। ভাল পাকা রাস্তা তাহার চলার জন্য দরকার হয় না।

ট্যাঙ্ক: সমতল রাস্তার দরকার নাই। ছোটোখাটো পাহাড়েও চলে।
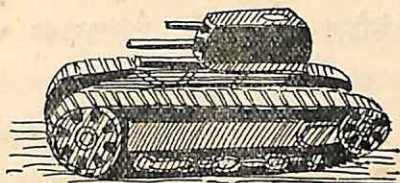
মানুষ চাহিল জলে চলিতে। জলপথে খুব দূর দূর দেশে যাওয়া প্রাচীন কাল হইতেই সুরু হইয়াছে। প্রথমে মানুষ কাঠ জুড়িয়া ভেলা করিয়া নদী পার হইল। তারপর নৌকা ব্যবহার
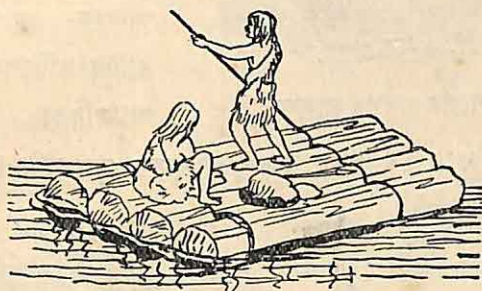
জলপথে চলা: ভেলা

করিতে লাগিল। বায়ু বহিলে যাহাতে নৌকা চালান সুবিধা হয়

জলপথে চলা: নৌকা

তাই পাল তোলা নৌকা ব্যবহার হইল। নৌকা ধীরে ধীরে চলে। নদীপ্রবাহ কোন দিকে চলিবে, বায়ু কোন দিকে বহিবে তাহার উপর

নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। তাহা সত্ত্বেও নৌকার ব্যবহার আজও উঠিয়া যায় নাই। ভারতবর্ষের বণিকেরা নৌকা চড়িয়া কত দেশ-বিদেশে ব্যবসা করিতে যাইত। পালের জাহাজ চড়িয়া সমুদ্রে ভাসিয়া নাবিকেরা কত দেশ আবিষ্কার করিল। ভাস্কো-ডাগামা ভারতবর্ষে আসার জলপথ খুঁজিয়া বাহির করিলেন। কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করিলেন। ক্যাপ্টেন কুক্ কত নূতন নূতন দেশ ঘুরিয়া বেড়াইলেন।
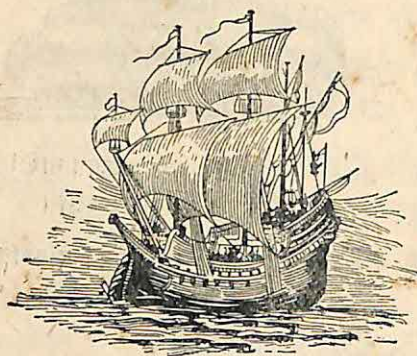
সেকালের পালের জাহাজ
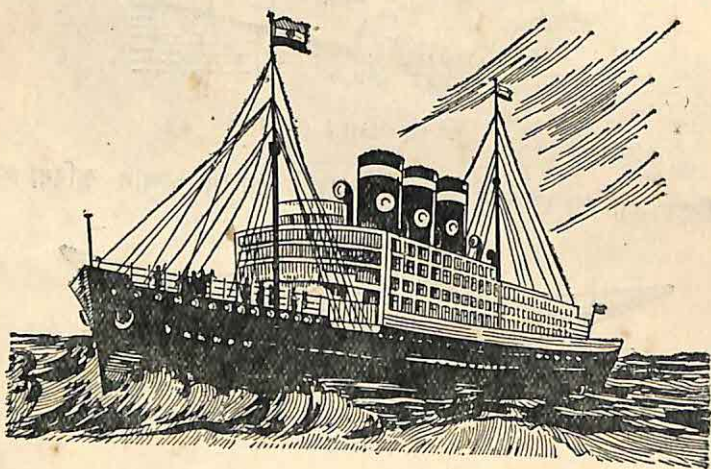
আধুনিক জাহাজ

বড় বড় জাহাজের গতিবেগ বাড়াইবার জন্য স্টিম এঞ্জিন ব্যবহার করা

সুরু হইল। আজকাল মাত্র আঠার দিনে বোম্বাই হইতে ইংলণ্ড জাহাজে করিয়া পৌছান যায়।

আকাশে উড়াঃ জল আর স্থলে মানুষ অনেক দিন হইতেই চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। আকাশে উড়িতে অনেক দিন পারে নাই। মানুষের ইচ্ছার শেষ নাই। উৎসাহের অন্ত নাই। হাইড্রোজেন গ্যাস বায়ুর চাইতে হাল্কা। খুব বড় রকমের বেলুন তৈয়ারি করিয়া তাহাতে হাইড্রোজেন গ্যাস ভর্তি করিয়া প্রথম আকাশে উড়া সুরু হইল। ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধের সময় 'জেপলিন' নামে উড়োজাহাজ যাত্রী আর ডাক লইয়া জার্মানি ও আমেরিকার মধ্যে যাওয়া-আসা করিল। 'হিণ্ডেনবার্গ' নামে আর একটা বড় উড়োজাহাজ চল্লিশজন যাত্রী লইয়া যাওয়া-আসা করিত। একদিন যখন যাত্রী লইয়া উড়িতে যাইবে তখন কেমন করিয়া যেন হাইড্রোজেন গ্যাসে আগুন
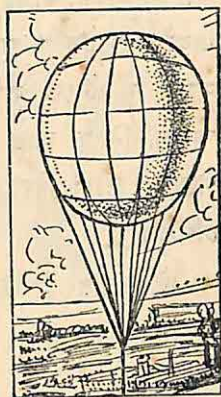
বেলুন
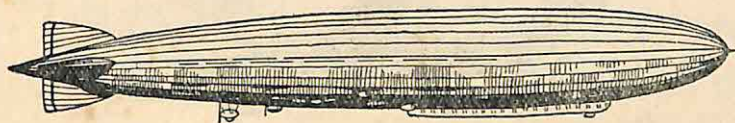
জেপলিন

ধরিয়া গেল। গ্যাস দাউ দাউ করিয়া জ্বলাতে অত বড় একখানা উড়োজাহাজ একটা জ্বলন্ত ধাতুর পিণ্ডে পরিণত হইল। হাইড্রোজেন সব চেয়ে হাল্কা গ্যাস। হিলিয়ম হাইড্রোজেনের চাইতে ভারী, তবে

বায়ুর চাইতে অনেক হাল্কা। হিলিয়ম গ্যাসে আগুন ধরে না। হিলিয়ম গ্যাস ব্যবহার করিলে আর আগুন লাগিত না। কিন্তু জার্মানিতে হিলিয়ম পাওয়া যাইত না। তাই ভর্তি করা যায় নাই।

পাখীর ডানা আছে। ডানা নাড়িয়া বায়ু কাটিয়া পাখী উড়ে। মানুষও পাখীর মত উড়িতে পারে এমন যন্ত্র তৈয়ারি করিতে চাহিল। ভাবিল একটা হাল্কা ধাতু দিয়া যান তৈয়ারি করা যাক। পাখা লাগান একটা মোটর থাকুক। পাখা জোরে ঘুরুক, আর বায়ু ভেদ করিয়া সমস্ত যানটাকে লইয়া চলুক। শক্ত অথচ হাল্কা ধাতু পাওয়া গেল। অ্যালুমিনিয়ম আর ম্যাগ্‌নেসিয়ম একসঙ্গে মিশানো ধাতু হাল্কা আর শক্ত। তাহা দিয়া উড়োজাহাজ তৈয়ারি হইল। হাল্কা পেট্রলে তাহা চলিল।

উইলবার রাইট আর আরভিন রাইট দুই ভাই সর্ব্বপ্রথম উড়ো-

প্রথম যুগের উড়োজাহাজ
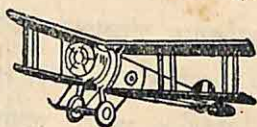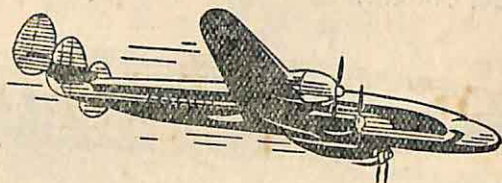
আধুনিক উড়োজাহাজ

জাহাজে বায়ু ভেদ করিয়া চলেন। ইহার চব্বিশ বছর পরে আমেরিকা হইতে আটলাণ্টিক মহাসমুদ্র পার হইয়া লিণ্ডবার্গ প্যারিস শহরে উড়িয়া আসেন। দূরত্ব কম নয়, তিন হাজার দুই শত মাইল।

গত মহাযুদ্ধে আকাশযানের সব চেয়ে বেশী উন্নতি হইয়াছে। আকাশে উড়িয়া বোমা ফেলা, প্যারাসুটে করিয়া সৈন্য নামান, খাবার ফেলা সবই উড়োজাহাজের সাহায্যে করা হইয়াছে। এখন দেশবিদেশে যাত্রী, ডাক, মালপত্র লইয়া যাওয়া-আসার জন্য উড়োজাহাজের ব্যবহার খুব চালু হইয়াছে। কুড়ি ঘণ্টাতে ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ড উড়িয়া যাওয়া সম্ভব হইয়াছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতি আমাদের কোথায় লইয়া ফেলিবে কে জানে!
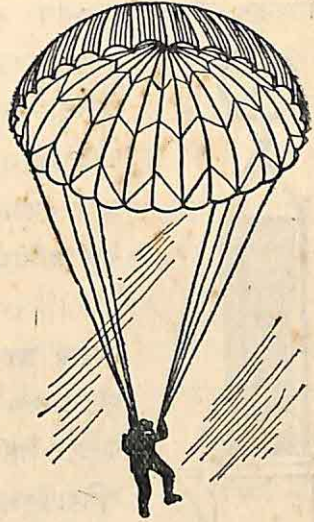
প্যারাসুট

বিজ্ঞানী ঃ আবিষ্কারের আনন্দ পাইয়া কত বিজ্ঞানী ধনদৌলত তুচ্ছ করিয়াছেন। এমন একজন হইলেন হম্ফ্রি ডেভি। অনেক কাল আগে কয়লার খনির ভিতরকার গ্যাস প্রায়ই জ্বলিয়া উঠিত। তাহাতে আগুনে পুড়িয়া খনির ভিতর অনেক শ্রমিক মারা পড়িত। গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে এরূপ অগ্নিকাণ্ড কি করিয়া বন্ধ করা যায় তাহা লোকে ভাবিতে লাগিল। বিশেষ সাবধান

হম্ফ্রি ডেভি

হইবার ব্যবস্থা করার জন্য কমিটি বসিল। কিন্তু শেষ অবধি অগ্নিকাণ্ড নিবারণ করা গেল না। কমিটির সভ্যরা বিজ্ঞানী হম্ফ্রি ডেভির কাছে আসিলেন। ডেভি অনেক রকম চেষ্টা করিয়া এক রকম বাতি তৈয়ারি করিলেন যাহা ব্যবহার করিলে ওই রকম গ্যাসে আগুন লাগার আর কোন সম্ভাবনা রহিল না। ডেভির এক বন্ধু বলিলেন, ওই বাতির তুমি একটা পেটেণ্ট নাও। পেটেণ্ট লইলে যত বাতি বিক্রয় হইত তাহার জন্য ডেভি কমিশন পাইতেন। বছরে পাঁচ হইতে দশ হাজার পাউণ্ড অনায়াসে তিনি আয় করিতে পারিতেন। ডেভি কিন্তু তাহা করেন নাই। বলিয়াছিলেন, মানুষের সেবা করিতে পারিয়াছি এই আমার বড় আনন্দ। এ আনন্দ আমার চিরদিন থাকিবে।

ডেভির বাতি

১৯১০ সালে মাদাম কুরী রেডিয়াম আবিষ্কার করেন। রেডিয়াম ক্যানসার রোগের অমোঘ ঔষধ বলিয়া জানা গেল। মাদাম কুরীও পেটেণ্ট লইয়া লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করিতে পারিতেন। তিনিও তাহা করেন নাই।

সম্প্রতি স্ট্রেপ্টোমাইসিন বলিয়া একটি ঔষধ বাহির হইয়াছে। কয়েকটা কঠিন রোগ এই ঔষধে সারিতেছে। ওয়াক্সম্যান স্ট্রেপ্টোমাইসিন আবিষ্কার করিয়া চল্লিশ লক্ষ টাকা পান। তিনি ওই টাকা এই জাতীয় ঔষধ আবিষ্কারের কাজে দান করিয়া গিয়াছেন।

মাদাম কুরী

এমনি কত নির্লোভ লোকের জীবন উৎসর্গের ফলে বিজ্ঞানের প্রসার হইতেছে। পানামার কোন কোন অঞ্চলে পীত জ্বর বলিয়া একটি রোগ হইত। মারাত্মক রোগ, বহু লোক ইহাতে মারা পড়িত। প্রথম প্রথম অনুমান করা গেল, এক রকম মশার কামড়ে এই রোগ ছড়ায়। কিন্তু ভাল করিয়া পরীক্ষা করা দরকার, সত্যই মশার কামড়ে ঐ রোগ হয় কি না। তাহা হইলে মশা ধরিয়া গায়ে বসাইয়া তাহার কামড় খাইতে হয়। তাহাতে পীত জ্বর হইলে বুঝা যাইবে যে ঐ রকম মশার কামড়ে ঐ রোগ জন্মায়। তারপর ঔষধ দিয়া ঐ রোগ সারাইতে হইবে। রোগের ঔষধ জানা নাই, অথচ জানা আছে রোগ মারাত্মক। কে মশার কামড় খাইতে রাজী হইবে? রোগ হইলে যদি না সারে! একজন অগ্রসর হইলেন। ইঁহার নাম ল্যাজিআর। তাহার পর আরও একজন আসিলেন। ইঁহার নাম ক্যারল। পরীক্ষা হইল। ল্যাজিআর প্রাণ দিলেন। কিন্তু আরও পরীক্ষা করা দরকার। আসিলেন কিসেনজার। ইনি একজন সৈনিক। আসিলেন মোরান, সেনাবিভাগের একজন কর্মচারী। মানবজাতির কল্যাণে ইঁহারা জীবন উৎসর্গ করিলেন। ইঁহারা কোন পুরস্কার লইলেন না। কোন পারিশ্রমিক লইতে সম্মত হইলেন না। শেষ অবধি পীত জ্বরের কারণ জানা গেল। ঔষধ বাহির হইল। পৃথিবীর অসংখ্য লোকের জীবন রক্ষা পাইল।

এইরূপে বহু বিজ্ঞানীর সমবেত প্রচেষ্টায়, অশেষ অধ্যবসায় সহকারে বহুকাল ধরিয়া ধীরে ধীরে কাজ করিয়া চলার ফলে বিজ্ঞান আজ এত অগ্রসর হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পৃথিবী

পৃথিবীর উৎপত্তিঃ পাথর-কাদা-মাটি-জল আরও কত জিনিস দিয়া গড়া আমাদের এই পৃথিবী। আজ ইহাতে কত রকমের মানুষ, কত জাতির জন্তু, গাছপালা সব রহিয়াছে। মোটামুটি হিসাবে দুই তিন শত কোটি বছর আগে এ সব কিছুই ছিল না। তখন পৃথিবী ছিল একটি দীপ্ত গ্যাসের পিণ্ড। এই অগ্নিপিণ্ড সূর্যের সঙ্গে মিশিয়া এক হইয়াছিল। একদিন অকস্মাৎ একটি বড় নক্ষত্র সূর্যের কাছ দিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। নক্ষত্রটির টানে সূর্য হইতে একটি দীপ্ত তপ্ত অংশ ছিটকাইয়া বাহির হইল। অংশটির আকার অনেকটা পটোলের মত। মাঝখানটা মোটা আর দুই ধার ক্রমশঃ সরু। এই অংশটি ক্রমে জমাট বাঁধিল। তারপর আবার ছোট ছোট টুকরা হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। ছোট টুকরাগুলি দুইধারে, বড়গুলি মাঝামাঝি জায়গায় ঠাঁই করিয়া লইয়া সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। এই টুকরাগুলি এক একটি গ্রহ। ইহাদের মধ্যে একটি টুকরা হইল আমাদের এই পৃথিবী। আবার অনেক দিন পরে পৃথিবীর গাত্র হইতে কিছুটা অংশ ছিটকাইয়া বাহির হইয়া আবার পৃথিবীর চারিপাশে ঘুরিতে লাগিল, ইহা হইল চাঁদ।

সূর্য হইতে পৃথিবী জন্ম লইল দীপ্ত গ্যাসের পিণ্ডরূপে। যতদিন যাইতে লাগিল পৃথিবী ধীরে ধীরে তত ঠাণ্ডা হইতে লাগিল। গ্যাসের পিণ্ড শীতল হইয়া তরল পিণ্ডে পরিণত হইল। তারপর আরও ঠাণ্ডা হইতে তাহার উপরকার স্তর দুধে সর পড়ার
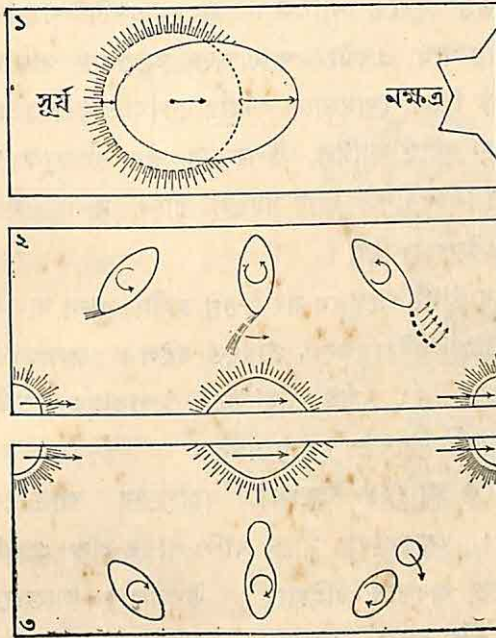
পৃথিবীর উৎপত্তি

১। অকস্মাৎ একটি নক্ষত্র সূর্যের কাছ দিয়া ছুটিয়া গেল। নক্ষত্রের টানে সূর্যের আকার কি ভাবে পরিবর্তন হইতে পারে তাহা দেখান হইল।

আয়তনে এক একটি নক্ষত্র প্রায় সূর্যের আয়তনের সমান। অনেক অনেক দূরে আছে বলিয়া নক্ষত্রগুলি অত ছোট দেখায়। সূর্যের কাছাকাছি আসিয়াছে বলিয়া নক্ষত্রটিকে সূর্যের মত বড় করিয়া দেখান হইল।

২। নক্ষত্রটির টানে সূর্য হইতে একটি দীপ্ত তপ্ত অংশ ছিটকাইয়া বাহির হইল। অংশটির আকার অনেকটা পটোলের মত। অংশটি ঘুরিতে লাগিল। আবার ছোট টুকরা হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। এই টুকরাগুলি এক একটি গ্রহ। ইহাদের মধ্যে একটি টুকরা হইল আমাদের এই পৃথিবী। ২নং ছবিতে দক্ষিণ অংশে গ্রহের জন্ম দেখান হইল।

৩। পৃথিবীর গাত্র হইতে কিছুটা অংশ ছিটকাইয়া বাহির হইল। অংশটি পৃথিবীর চারিপাশে ঘুরিতে লাগিল, ইহা হইল চাঁদ।

মত ক্রমশঃ শক্ত হইতে থাকিল। ক্রমে এতটা শক্ত হইল যে, পৃথিবীর উপরিভাগে একটা পুরু শক্ত আস্তরণ গড়িয়া উঠিল। ইহাতে মোচড় দিলে দোমড়ায়, আবার কোথাও ফাটিয়া যায়। এই ভাবে যত ঠাণ্ডা হইতে লাগিল, উপরকার স্তর তত পুরু আর শক্ত হইতে লাগিল। ধরাপৃষ্ঠ আর সমতল রহিল না। কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু হইতে লাগিল।

শক্ত স্তরের উপরিভাগে যে সব উত্তপ্ত জলীয় বাষ্প বা স্টিম ছিল, তাহা ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়া জলে পরিণত হইল। জল গড়াইয়া গিয়া জমিল নীচু জায়গায়। সেই জমা-জলে মহাসাগর সৃষ্টি হইল। খুব উঁচু জায়গাগুলি পর্বতরূপে গণ্য হইল।

ভূমিকম্প ও আগ্নেয় উচ্ছ্বাসঃ ধরাপৃষ্ঠের আস্তরণের নীচে তাপ খুব বেশী। আস্তরণের নীচে বালি-পাথর-ধাতু প্রভৃতি পদার্থ নরম বা গলিত অবস্থায় রহিয়াছে। উপরকার আস্তরণের চাপে গলিত পদার্থ বদ্ধ হইয়া আছে। আবার এ আস্তরণটা সব জায়গায় সমান শক্ত নয়। কোন কোন জায়গায় দুর্বল, আবার কোথাও ফাটলও আছে। ভিতরকার গলিত পদার্থ এক জায়গা হইতে আর এক জায়গায় গড়াইয়া যায়। এমনি ভাবে পৃথিবীর অভ্যন্তরের গলিত পদার্থ গড়াইতে থাকিলে উপরকার আস্তরণ কাঁপিতে থাকে। তাহাকে বলে ভূমিকম্প। কখনও বা গলিত পদার্থের সঙ্গে আবার উত্তপ্ত গ্যাস থাকে। গ্যাসটা উপরে উঠিয়া আসিতে চায়। আস্তরণ ফাটাইয়া গলিত পদার্থ ফাঁপিয়া উঠে। বাহির হইয়া আসিতে চায়। চাপ প্রবল হইলে আস্তরণ ফাটিয়া যায়। তখন ফাটল দিয়া তুবড়ির উচ্ছ্বাসের মত জ্বলন্ত মাটি-পাথর গলিত অবস্থায় বাহির হইয়া আসে। এই হইল আগ্নেয় উচ্ছ্বাস।

ইটালীতে ভিসুভিয়স নামে এক আগ্নেয়গিরি আছে। অনেক দিন আগে ইহা হইতে তুবড়ি ফোটার মত এত গরম ছাই আর গলিত পাথর বাহির হইয়াছিল যে, তাহার কাছাকাছি দুইটি শহর ছাই চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। শহর দুইটির নাম হারকিউলেনিয়ম ও পম্পেয়াই। শহরের লোকজন কেহ আর বাঁচে নাই।
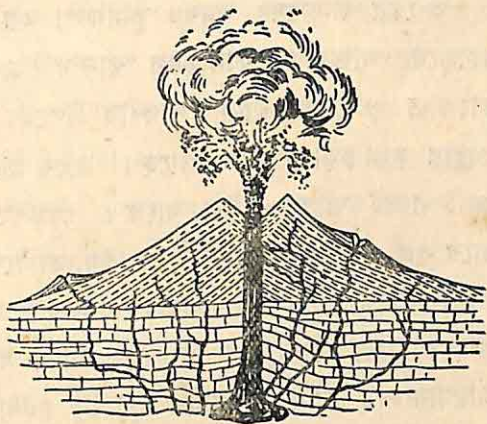
আগ্নেয় উচ্ছ্বাস

এক একটি আগ্নেয় উচ্ছ্বাস এত প্রবল, এত সর্বনাশা হয় যে, কয়েক মিনিটের মধ্যে কাছাকাছি বড় শহর একেবারে পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিতে পারে। এমনি ঘটিয়াছিল মঁপিলের আগ্নেয় উচ্ছ্বাসে ; তাহার কাছে স্যাঁ পের শহরটি কয়েক মিনিটে একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। পঁচিশ-তিরিশ হাজার লোক মারা গিয়াছিল। জাভার কাছাকাছি ক্রাকাটোয়া দ্বীপে সবচেয়ে বড় আগ্নেয় উচ্ছ্বাস হইয়া গিয়াছে। উপরকার আস্তরণ ভেদ করিয়া উচ্ছ্বাস উপরে উৎক্ষিপ্ত হইবার সময় ভীষণ জোরে শব্দ হইয়াছিল। তিন হাজার মাইল দূরে সে শব্দ শোনা গিয়াছিল। বড় বড় পাথর আর মাটির চাঙড় ছিটকাইয়া সমুদ্রের জলে পড়িয়াছিল। সমুদ্রের জল লাফাইয়া উঠিয়াছিল একশত ফুট উঁচু অবধি। সমুদ্রের তীরে এমন বড় বড় ঢেউ আসিয়া ধাক্কা দিয়াছিল যে, ছত্রিশ হাজার

লোক মারা পড়িয়াছিল। এত ধূলা উড়িয়াছিল যে, একশত মাইল পর্যন্ত দিনের বেলাতেই কাল অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল।

আগ্নেয় উচ্ছ্বাসের সময়ও ভূমিকম্প হয়। আবার কোন সময় ধরাপৃষ্ঠের আস্তরণের কোন দুর্বল স্থান যদি একটু আধটু বসিয়া যাইতে থাকে ত ভূমিকম্প হয়। পৃথিবীর উপরের স্তর বেশ শক্ত হইলেও তাহার নড়া-চড়া এখনও আছে। মাঝে মাঝে কোন কোন জায়গায় ওলট-পালট আজও হইয়া থাকে। দেড়শত বছর আগে সিন্ধুনদের ধারে কচ্ছ প্রদেশে যে ভূমিকম্প হয়, তাহাতে দুই হাজার বর্গ মাইল জমি সমুদ্রের তলায় চলিয়া যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে কাছে একটা উঁচু পাহাড় উঠিয়া পড়ে। পঞ্চাশ বছর আগে আলাস্কার ভূমিকম্পে এক জায়গায় জমি প্রায় সাতচল্লিশ ফুট উঁচু হইয়া উঠে। ১৯৩৪ সালের ভূমিকম্পে সমস্ত উত্তর বিহার ও কাঠমণ্ডু অঞ্চলে দুই তিন মিনিটের নড়া-চড়ার ফলে খুব বড় ক্ষতি হইয়া যায়। অনেক জায়গায় বড় বড় গভীর ফাটলের সৃষ্টি হয়, আর তাহার ভিতর হইতে ফোয়ারার মত কাদা-গোলা জল, পাথর, বালি সব বাহির হইতে থাকে। লক্ষ লক্ষ বিঘা জমি কাদা ও বালি চাপা পড়িয়া চাষের অযোগ্য হইয়া যায়। এই রকম নড়া-চড়া সচরাচর হয় না, এই যা রক্ষা।

পৃথিবীর পরিবর্তন : পৃথিবীর জমি, পাহাড়ের পরিবর্তন যে কেবল ভূমিকম্পে আর আগ্নেয় উচ্ছ্বাসে হয়, এমন নয়। বায়ু বহিতেছে পাহাড়ের চূড়াতে, মাটির বুকেতে। ধীরে ধীরে উড়াইয়া লইতেছে ধূলা-বালি। যেখানে বেশী ঝড় বহিতেছে সেখানকার মাটি ধীরে ধীরে ক্ষয় হইতেছে। ধূলাবালি উড়িয়া আবার অন্য কোথাও গিয়া জমিতেছে। সূর্যের তাপে কাদামাটি শুকাইয়া চূর্ণ হইয়া ধূলা হইয়া যাইতেছে। বৃষ্টির ধারাও মাটির বুকে পড়িয়া,

মাটিকে ভিজাইয়া নরম করিয়া ধ্বসাইয়া ফেলিতেছে। পাহাড়ের গায়ে প্রচুর বৃষ্টি পড়ার জন্য অনেক সময় বড় বড় গাছ শিকড়ের মাটি নরম হইয়া যাওয়াতে উপড়াইয়া যায়। কত পাথর খসিয়া পড়ে। ১৯৫০ সালে আসাম ও দারজিলিং অঞ্চলে জুন মাসে প্রচুর বৃষ্টি আর তাহার সঙ্গে ঝড়ের ফলে পাহাড় ধ্বসিয়া বহু জায়গায় রাস্তা ভাঙ্গিয়া যায়। বাড়ি ধ্বসিয়া যায়। অনেক লোক মারা পড়ে। পূর্ববঙ্গে কত জায়গায় যেখানে এককালে নদী প্রবাহিত হইত আজ সেখানে ক্রমে চর পড়িয়া ডাঙার উদ্ভব হইয়াছে।

তারপর নদী কত জল বহিয়া লইয়া সমুদ্রে গিয়া মিশিতেছে। সঙ্গে লইয়া যাইতেছে কত পাথর, কাদা, মাটি, বালি, কত চুন আর নুন। রোদ-ঝড়-বৃষ্টির জন্য কাদা, মাটি, ধূলা, বালি সৃষ্টি হইতেছে। এমনি যদি কোটি কোটি বছর ধরিয়া চলে তাহা হইলে ভয় হয়, পাহাড় ভূমি সবই সাগরের তলায় চলিয়া যাইবে। সব কিন্তু জলের তলায় যাইতেছে না। নদীতে বহিয়া-চলা মাটি বালি-পাথর থিতাইয়া গিয়া স্তরের উপর স্তর জমিয়া উঠে। এমনি করিয়া আবার নূতন ভূমি গড়িয়া উঠে। আমাদের এই বাংলা দেশের এককালে অস্তিত্ব ছিল না। গঙ্গা নদী দিয়া বহিয়া-আসা বালি আর মলিমাটির স্তর জমা হইয়া বাংলা দেশ সৃষ্টি হইয়াছে।

ভারতবর্ষের উত্তর দিকে রহিয়াছে উচ্চ হিমালয় পাহাড়। হিমালয় পাহাড় গড়িয়া উঠিয়াছে লক্ষ লক্ষ বছরের সমুদ্রের তলায় সঞ্চিত পলি স্তর দিয়া। দুইদিক হইতে চাপ পাইয়া মোটা স্তরগুলি উচ্চ হইয়া উপরে উঠিয়া গিয়াছে। একখানা কাগজ মেঝের উপর রাখিয়া তাহার দুইধার হইতে ভিতরের দিকে ঠেলিয়া দিলে যেমন হয় সেইভাবে। কেমন করিয়া জানিতে পারি, হিমালয়

সমুদ্রের তলায় জমা স্তরের সৃষ্টি? স্তর যখন জমিয়াছিল তখন কোন কোন স্তরের সামুদ্রিক জন্তুর মৃতদেহ চাপা পড়িয়াছিল। হিমালয়ের স্থানে স্থানে সামুদ্রিক জন্তুর কঙ্কালের ছাপ, আবার কোথাও বা জমাট বাঁধা কঙ্কাল দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

পলিপাথর: নদীর জল বহিয়া চলার সঙ্গে কাদা-মাটি-বালির পলি পড়িয়া পড়িয়া যে স্তর জমাট বাঁধে তাহাকে বলে পলি পাথর।
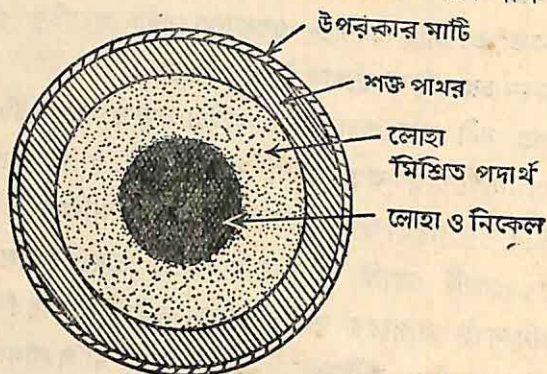
পৃথিবীর অভ্যন্তর

পলিপাথর জন্মিয়াছে সমুদ্রের তলায়। নদীর গর্ভেতেও জন্মিয়াছে, বড় বড় হ্রদের তলাতেও জন্মিয়াছে। মাটির স্তর এক জাতের পলিপাথর। বেলে পাথরও পলিপাথর। এমন কি, খড়িমাটি, বালির কণা সবই পলিপাথর। অনেক সময় পলির স্তরের উপর স্তর জমিবার সময় কোন জীবজন্তুর মৃতদেহ হয়ত চাপা পড়িয়া গেল। তাহাদের কঙ্কাল জমাট বাঁধিয়া পাথর হইয়া পলিপাথরের ভিতর আটক পড়িয়া আছে দেখা যায়।

আগ্নেয় পাথর: পৃথিবীর ভিতরের তপ্ত তরল পদার্থ কোন কোন স্থানে ঠাণ্ডা হইয়া জমাট বাঁধিয়া পাথর হইয়া আছে। ইহাকে

বলে আগ্নেয় পাথর। এই পাথর খুব শক্ত। ইহাতে স্তরের চিহ্ন নাই। পলি পাথরের অপেক্ষা আগ্নেয় পাথর অনেক শক্ত। ভারত-বর্ষের দক্ষিণ প্রদেশে, বোম্বাই প্রদেশে আগ্নেয় পাথর দেখা যায়।

রূপান্তরিত পাথর ঃ ধরাপৃষ্ঠ ওলট-পালট হইয়া কোথাও উপরের দিকে উঠিয়া গেলে পাহাড় সৃষ্টি হইল। আর কোথাও নীচের দিকে নামিয়া আসিলে উপত্যকা সৃষ্টি হইল। এই রকম পাহাড় আর উপত্যকা সৃষ্টির সময় পলিপাথর আর আগ্নেয় পাথরের উপর খুব চাপ পড়ে। তাহার জন্য তাপও খুব বাড়িয়া উঠে। চাপ আর তাপের জন্য আগ্নেয় পাথরের আর পলিপাথরের অনেক রূপান্তর ঘটে। কোথাও আবার দেখা যায়, পলিপাথরের মধ্যে আগ্নেয়পাথর ঢুকিয়া গিয়াছে। এই সব পাথরকে তাই রূপান্তরিত পাথর বলে।

ধরাপৃষ্ঠের উপরে আগ্নেয় পাথর আর রূপান্তরিত পাথরের একটা আবরণ রহিয়াছে। আবরণের তলায় কি আছে? আরও অনেক গভীর তলদেশেই বা কি আছে?

মাটির নীচে মানুষ দেড় মাইলের বেশী আর নামিতে পারে না। পৃথিবী হইল একটা বড় গোলক। পৃথিবীর কেন্দ্র হইল চার হাজার মাইল নীচে। নীচে না নামিয়াও অন্য উপায়ে পৃথিবীর ভিতরকার অনেক খবর মানুষ পাইয়াছে। উপরিভাগের পাথুরিয়া স্তর প্রায় চল্লিশ মাইল পর্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। তাহার নীচের স্তর গলিত পিচের মত। এই স্তর প্রায় আঠার শত মাইল গভীর। ইহা লোহা আর সিলিকাতে ভর্তি। ইহার নীচের স্তর লোহা আর নিকেলে ভর্তি, গলিত তপ্ত লোহা আর নিকেল।

কয়লা ঃ পৃথিবীতে সব চেয়ে আগে দেখা দিল উদ্ভিদ। তাহার অনেক পরে, দেখা দিল জীবজন্তু আর মানুষ। সূর্যের কিরণ পাইয়া

উদ্ভিদ বাড়িয়া উঠিল, পৃথিবী জুড়িয়া বড় অরণ্য গড়িয়া উঠিল। অনেকদিন ধরিয়া এই রকম চলিল। কখনও কখনও পৃথিবীর স্থানে স্থানে নড়াচড়ার ফলে কিছু কিছু বনজঙ্গল মাটি চাপা পড়িয়া গেল। মাটি চাপা পড়িয়া ধীরে ধীরে সেখানে উদ্ভিদের দেহের রূপান্তর হইতে থাকিল। শেষ অবধি রূপ লইল পাথুরিয়া কয়লার।
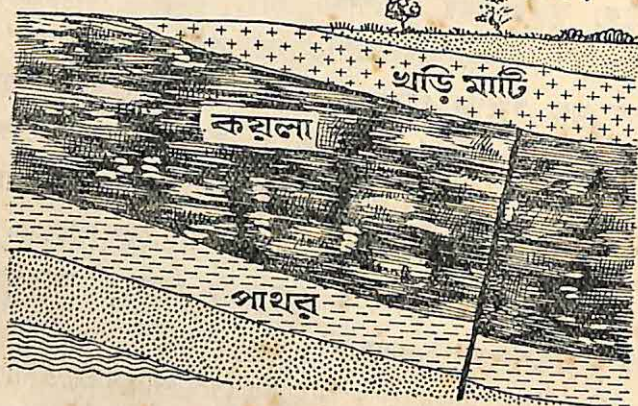
ভূগর্ভে পাথরিয়া কয়লার স্তর

মানুষ যখন ক্রমে আগুনের ব্যবহার শিখিল তখন শীত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আগুন ব্যবহার করিল। শুকনা কাঠ পোড়াইয়া সে আগুন জ্বালাইল। কয়লা হইতে মানুষ প্রথম তাপ সৃষ্টি করিল। তারপর কয়লাকে ক্রমে ক্রমে বিবিধ কাজে লাগাইল। পাথর হইতে ধাতু তৈয়ারি করিবার জন্য কয়লা ব্যবহার করিল। তামা বা লোহা-থাকা পাথর আর কয়লা মিশাইয়া গনগনে আগুনে পোড়াইয়া তামা বা লোহা ধাতু তৈয়ারি করিল। কয়লার আগুনে জল গরম করিয়া স্টিম তৈয়ারি করিয়া তাহার শক্তিতে এঞ্জিন চালাইল। দেশবিদেশে

রেলগাড়ি চালাইল। বদ্ধ পাত্রে কয়লা পোড়াইয়া গ্যাস তৈয়ারি করিল। সেই গ্যাস দগ্ধ করিয়া রাস্তায় আলো জ্বালাইল। স্টিম তৈয়ারি করিয়া কলের চাকা ঘুরাইয়া তড়িৎশক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা হইল। ট্রাম চালাইতে তড়িৎ, পাখা ঘোরাইতে তড়িৎ, আলো জ্বালাইতে তড়িৎ, তড়িৎ শক্তির বিবিধ ব্যবহার সুরু হইল।

কয়লা হইতে গ্যাস তৈয়ারি করার সময় সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া গেল আলকাতরা। আবার এই আলকাতরা হইতে তৈয়ারি হইল নানারকমের রং, নানারকমের ঔষধ। আবার অনেক গন্ধদ্রব্যও তৈয়ারি হইল।

ভূগর্ভ হইতে পেট্রল তোলা

বাংলা দেশে কয়লার খনি আছে রাণীগঞ্জে আর বরাকরে। বিহারে আছে ঝরিয়া, করণপুরা, রামগড় আর গিরিডিতে। মধ্য-প্রদেশে আছে, হায়দ্রাবাদে আছে।

খনিজ ঃ গলিত অবস্থার পাথর ক্রমে তাপ হারাইয়া শক্ত হইয়া উঠিলে আগ্নেয় পাথর সৃষ্টি হয়। তামা, লোহা, অ্যালুমিনিয়মের খনিজ পাথর আগ্নেয় পাথরের মতই গলিত অবস্থার পাথর হইতে ক্রমে সৃষ্টি হইয়াছে। ধাতুর খনিজগুলি আবার অনেক সময়ে মাটির ভিতর তাপ আর চাপে রূপান্তরিত পাথরের সঙ্গে সৃষ্টি
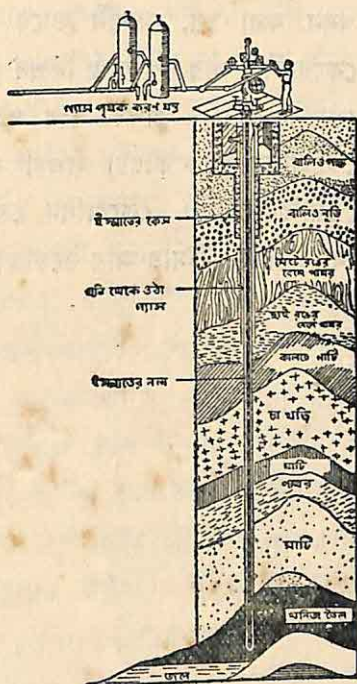
হয়। আমাদের দেশে অনেক খনিজ আর দামী পাথর পাওয়া যায়। তামা, লোহা, অ্যালুমিনিয়ম, সোনা সবেরই খনিজ এই দেশে মেলে।

কেরোসিন আর পেট্রল ঃ মাটির তলা হইতে পাওয়া গিয়াছে কেরোসিন আর পেট্রল। মাটিতে যেমন জল তুলিবার জন্য নলকূপ খনন করা হয়, তেমনি ভাবে আরও অনেক গভীর নলকূপ খুঁড়িয়া কেরোসিন আর পেট্রলের মিশ্রণ তুলিবার ব্যবস্থা করা হয়। তুলিয়া শোধন করিলে প্রথম অংশ হইতে পেট্রল, তার পরের অংশ হইতে কেরোসিন পৃথক করিয়া লওয়া যায়। সর্বশেষে পড়িয়া থাকে বাতি তৈয়ারির মোম। কেরোসিন তেলে আলো জ্বালান হয়। পেট্রলে মোটরগাড়ী, স্টিমার আর উড়োজাহাজ চলে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জল ও বায়ু

বায়ুমণ্ডল ঃ ঘরের মধ্যে আসবাবপত্র থাকে। আমরা বলি ঘর-ভতি আসবাব। ঘরে বেশী লোক থাকিলে বলি ঘর-ভর্তি লোক। কিন্তু ঘরের প্রতিটি কোণ, উপরে কড়িকাঠ পর্যন্ত ত আর আসবাব থাকে না। তবে কি বাকি জায়গাটা শূন্য থাকে? না, মোটেই শূন্য থাকে না। পৃথিবীর চারিদিক জুড়িয়া রহিয়াছে বায়ু। ঘরের জন্য সব জায়গা জুড়িয়া থাকে বায়ুতে। গেলাস ভর্তি জল ছিল। অর্ধেকটা ফেলিয়া দিলাম। অর্ধেকটা সঙ্গে সঙ্গে বায়ুপূর্ণ হইয়া গেল। বায়ু আসিল কোথা হইতে? বায়ু ঘরে-বাহিরে চারিদিকে রহিয়াছে। আমরা বলি আমাদের আশে-পাশে উপরে বায়ুমণ্ডল রহিয়াছে। উপরে অনেক দূর অবধি আছে। তবে ক্রমশঃ খুব পাতলা হইয়া গিয়াছে। বেলুনে চড়িয়া মানুষ উপরে উঠিল। কিছু দূর উপরে উঠিয়া দেখিল বায়ু এত পাতলা আর হালকা হইয়া আসিল যে শ্বাস লওয়া যায় না। তখন অক্সিজেন গ্যাসের শ্বাস লইবার ব্যবস্থা করিয়া মানুষ আবার উপরে উঠিল। সাড়ে তের মাইলের কিছু বেশী উঁচু অবধি গেল। দেখিল সেখানকার বায়ু স্থির। খুব ঠাণ্ডা। সূর্যের আলো খুব প্রখর।

বায়ু জিনিসটা কি? বায়ু আমরা দেখিতে পাই না। বায়ুর কোন রং নাই। পাখা নাড়িলে বায়ুর চলাচল বুঝিতে পারি। বায়ু যে দিকে বহে, সে দিকে গন্ধ বাহিয়া লইয়া যায়। বায়ুর নিজের কোন গন্ধ নাই।

রোজই দেখি আগুন বেশ জোরালো গনগনে করিবার জন্য বায়ুর দরকার হয়। কামারশালে কয়লা পোড়াইয়া হাপরে করিয়া বায়ু দিতে দিতে গনগনে আঁচ তৈয়ারি করা হয়। তাহার এত উত্তাপ হয় যে, লোহা পুড়িয়া টকটকে লাল হইলে নরম হইয়া যায়। নরম লোহায় হাতুড়ি পিটিয়া নানারকম গঠন দেওয়া চলে।

কোন জিনিষ পোড়াইলে বায়ুর কি কোন পরিবর্তন হয়? এক পাত্র জলে একটা পিরিচ ভাসাইয়া তাহার উপর জ্বলন্ত মোমবাতি রাখিলাম। উপরে একটা বেলজার দিয়া ঢাকা দিলাম। খানিক পরে মোমবাতির শিখা নিবিয়া গেল। আর পাত্রের জল বেলজারের
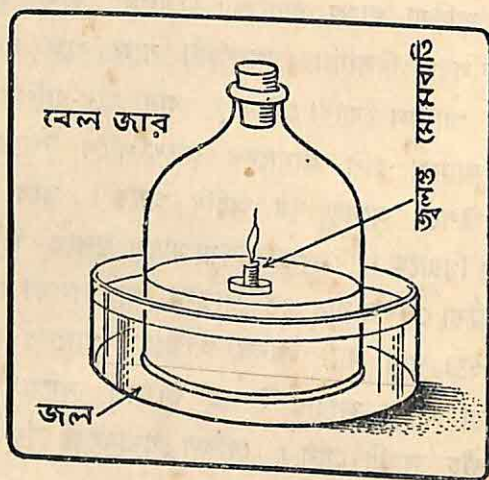
বেলজার দিয়া পরীক্ষা

ভিতরে বেশ খানিকটা উঁচুতে উঠিয়া গেল। বেলজারের মুখের ছিপিটা সামান্য খুলিয়া একটি জ্বলন্ত পাটকাঠি নামাইয়া দিলাম। কাঠিটা সঙ্গে সঙ্গে নিবিয়া গেল। বোঝা গেল, বেলজারের ভিতর বন্ধ-থাকা বায়ুর কিছুটা পরিবর্তন হইয়াছে। বায়ুর খানিকটা অংশ মোমবাতি

জ্বলিবার সময় খরচ হইয়া গিয়াছে। যে আয়তন বায়ু খরচ হইয়াছে, বেলজারের ভিতরে জল উঠিয়া আসিয়া সেই আয়তন পূর্ণ করিয়াছে। শুধু তাই নয়, বাকি যে বায়ুটা পড়িয়া আছে তাহাতে আর আগুন জ্বলন্ত অবস্থায় থাকিতেছে না। বায়ুর যে অংশ মোমবাতির শিখা জ্বলন্ত রাখিতে খরচ হইয়া গেল, সেই অংশ হইল অক্সিজেন গ্যাস।

অক্সিজেন গ্যাসপূর্ণ পাত্রে নিব-নিব দেশলাই কাঠি প্রবেশ করাইলে সঙ্গে সঙ্গে কাঠিটি জোরে জ্বলিয়া উঠে। বায়ুতে মিশিয়া থাকা অক্সিজেনের শ্বাস লইয়া পশু-পাখী-মানুষ বাঁচে। অক্সিজেন না থাকিলে শ্বাস বন্ধ হইয়া প্রাণী মারা যায়। পাহাড়ের চূড়ায় বায়ু পাতলা। অক্সিজেনের পরিমাণও তাহাতে কম। আরোহীদের তাই উপরে উঠিলে শ্বাস কষ্ট হইতে থাকে। অক্সিজেন গ্যাসের শ্বাস লইলে পাহাড়ে উঠিতে আর শ্বাস কষ্ট হয় না। নিউমোনিয়া জাতের রোগে শ্বাস কষ্ট কমাইবার জন্য ডাক্তারেরা অক্সিজেনের শ্বাস লইতে বলেন। জলে সামান্য পরিমাণে অক্সিজেন দ্রবিত থাকে। জলচর প্রাণীর শ্বাস গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া থাকার পক্ষে ঐটুকু অক্সিজেনই যথেষ্ট। জল ফুটাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া তাহাতে মাছ ছাড়িয়া রাখিলে বাঁচে না। জল ফুটাইলে অক্সিজেন উবিয়া যায়। মাছ সে জলে আর অক্সিজেন পায় না। শ্বাস বন্ধ হইয়া মরিয়া যায়।

এইবার ঐ বেলজারের ভিতর মোমবাতি জ্বালানর পরীক্ষাটার কথা বলি। মোমবাতি নিবিয়া যাইবার পর বায়ুর যে অংশটা পড়িয়া থাকে তাহা হইল নাইট্রোজেন গ্যাস। বায়ুর ৫ ভাগের ৪ ভাগ হইল নাইট্রোজেন গ্যাস, আর বাকী এক ভাগ হইল অক্সিজেন গ্যাস। নাইট্রোজেন গ্যাসের কোন রং নাই, গন্ধ নাই। নাইট্রোজেন গ্যাসে মোমবাতি জ্বলে না। কোন আগুন জ্বলে না।

কার্বন ডাইঅক্সাইড ঃ বায়ুতে অনেক রকম গ্যাস মিশ্রিত আছে। তাহার মধ্যে নাইট্রোজেনের পরিমাণ সবচেয়ে বেশী, তারপর অক্সিজেন, আর আছে অল্প পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস। এই সব ছাড়া বায়ুতে আর কতকগুলি গ্যাস সামান্য পরিমাণে মিশ্রিত আছে।

ছবিতে সাজান যন্ত্র লইয়া বোতলের ভিতর মার্বেল পাথর রাখিলাম। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড জলে দ্রবিত করিয়া ফানেলে
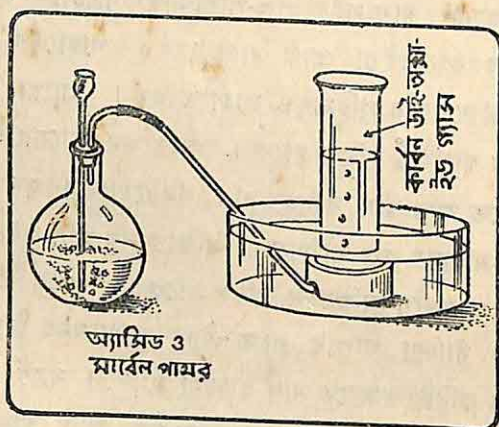
কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস তৈয়ারি করা

ঢালিলাম। ঐ অ্যাসিড পাথরের সংস্পর্শে আসিতেই কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের বুদবুদ উঠিতে লাগিল। ক্রমে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস গ্যাস-জারে জমিতে লাগিল।

গ্যাসটির কোন রং নাই। গ্যাস-জারে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস আছে কিনা তাহা চোখে দেখিয়া বোঝা যায় না। একটা জ্বলন্ত দেশলাই কাঠি গ্যাস-জারের মুখে ধরিলাম। দেশলাই নিবিল না।

তাহা হইলে জারটি গ্যাসে পূর্ণ নয়। আর একটি জারে জ্বলন্ত কাঠি প্রবেশ করাইলাম, কাঠি নিবিয়া গেল। বুঝা গেল, এই গ্যাস-জারে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস কানায় কানায় ভরিয়া আছে।

আমরা শ্বাস ত্যাগ করিলে যে-বায়ু বাহিরে আসে তাহাতে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস মিশ্রিত আছে। ইহা দেখান শক্ত নয়। একটি নলের সাহায্যে যদি চুনের জলে ভুড়ভুড়ি কাটি তাহা হইলে দেখি যে, জল ঘোলা হইয়া আসিতেছে।

নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়া বায়ুতে কিছু জলীয় বাষ্প মিশিয়া আছে। এ সব ছাড়া অল্প পরিমাণে আর্গন, নিয়ন, ক্রিপ্টন, জেনন ও হিলিয়ম নামে কতকগুলি গ্যাস বায়ুতে মিশিয়া আছে। হিলিয়ম গ্যাস হালকা বলিয়া বেলুন আর উড়োজাহাজে ভরিয়া লওয়া হয়। কাঁচের নলে নিয়ন গ্যাস ভরিয়া বিশেষ কৌশলে তড়িৎ চালনা করিলে লাল আলো দেখা দেয়। নিয়ন গ্যাসের পরিবর্তে আর্গন গ্যাস, আর তাহার সহিত একটু পারদ থাকিলে নীল আলো দেখায়। কাচের নলের রং ব্রাউন হইলে নীল না দেখাইয়া সবুজ দেখায়। সহরের রাস্তায় আজকাল যে-সব উজ্জ্বল লাল-নীল-সবুজ আলোর বিজ্ঞাপন দেখি, সেগুলি এই ভাবে তৈয়ারি।

অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের আদান-প্রদান ঃ বায়ুর অক্সিজেন গ্যাস ত নিয়ত খরচ হইয়া যাইতেছে। জীবজন্তু শ্বাস লইতেছে, ঘরে ঘরে লোকে কয়লা পোড়াইতেছে। কল-কারখানায় বড় বড় চুলাতে আগুন জ্বলিতেছে। এইসবে অক্সিজেন খরচ হইতেছে, আর কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হইতেছে। তবে কি একদিন বায়ুর সব অক্সিজেন নিঃশেষ হইয়া যাইবে? না, তাহা হইবে না। যেমন একদিকে এইভাবে অক্সিজেন খরচ হইতেছে আর কার্বন

ডাইঅক্সাইড জন্মাইতেছে, তেমনই ঐ কার্বন ডাইঅক্সাইড হইতে আবার উদ্ভিদের সাহায্যে অক্সিজেন তৈয়ারি হইতেছে।

সূর্যের আলোর সাহায্যে গাছের সবুজ পাতা কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস শোষণ করে। আর কার্বনের অংশটুকু নিজেদের শরীর গঠনের জন্য রাখিয়া অক্সিজেন গ্যাস ত্যাগ করে। তাই বায়ুর অক্সিজেন আর কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ কমেও না, বাড়েও না। জীবজন্তু আর গাছপালার মধ্যে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের এইভাবে একটা আদান-প্রদান চলে। এই আদান-প্রদান আছে বলিয়া পৃথিবীতে গাছপালা, পশুপাখী সব বাঁচিতে ও বাড়িতে পারে।
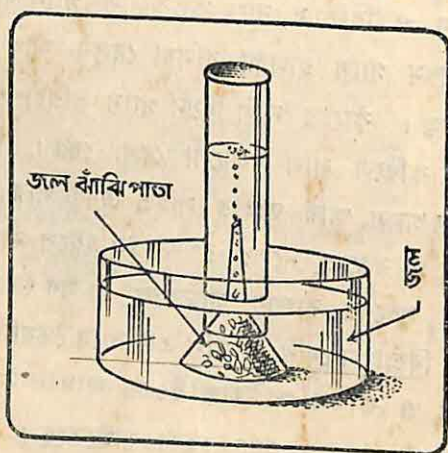
উদ্ভিদের অক্সিজেন ত্যাগ

পুকুর হইতে কয়েকটা জলঝাঁঝি তুলিয়া আনিয়া ফানেলের তলায় জলে ডুবাইয়া রাখিলাম। রৌদ্রে রাখিলে এই সবুজ পাতা হইতে একটা গ্যাসের বুদবুদ বাহির হয়। তারপর ধীরে ধীরে বুদবুদগুলি উপরে উঠিয়া গ্যাস-জারের ভিতরে সঞ্চিত হয়। গ্যাস-জারটা তুলিয়া

লইয়া নিব-নিব দেশলাই কাঠি প্রবেশ করাইলে সঙ্গে সঙ্গে উহা জ্বলিয়া উঠে। গ্যাসটি তাহা হইলে অক্সিজেন। সূর্যকিরণ পাইলে উদ্ভিদের সবুজ পাতা অক্সিজেন ত্যাগ করে।

জলঃ বায়ু না থাকিলে আমরা বাঁচিতে পারিতাম না। জল না হইলেও বাঁচি না। জল আমরা পান করি, আবার নানা রকম খাবারের মধ্য দিয়াও আমাদের শরীর অনেকটা জল গ্রহণ করে। পৃথিবীতে স্থলের চাইতে জলের পরিমাণ বেশী। পৃথিবীতে এত জল আছে বলিয়াই এত গাছপালা, পশুপাখী, মানুষ সব বাঁচিয়া আছে। তাহা না থাকিলে পৃথিবী মরুভূমি হইয়া যাইত। ইহাতে মানুষ থাকিত না, অন্য কোন জীবজন্তু বা গাছপালা কিছুই থাকিত না। গাছপালা, জীবজন্তুর শরীরের ভিতরেও অনেক জল আছে। আমাদের দেহের মেদ, মজ্জা, মাংসে, এমন কি হাড়ে, নখে, চুলে পর্যন্ত জল আছে। এ জল আমরা চোখে দেখিতে পাই না বটে, তবে পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারি। একজন মানুষের ওজন ধরিলাম দেড় মণ। তাহার শরীরে জল আছে খুব কম করিয়াও আধ মণ। তাহার শরীরে জলের পরিমাণই হইল আধ মণ, আর বাকি এক মণ হইল হাড়, মাংস ইত্যাদির ওজন। শাকসব্জীতেও জলের পরিমাণ কম নয়। এক সের পালং শাকে অন্ততঃ আড়াই পোয়া জল। যত টাটকা ঢলঢলে পাতা তত বেশী জল। এক সের পালং শাক কিনিয়া বেশ করিয়া রৌদ্রে শুকাইলে দেখা যায়, শাকের ঢলঢলে পাতাগুলি কুঁচকাইয়া পাতলা হইয়া আসিতেছে, সুডোল ডাঁটাগুলি রোগা হইয়া যাইতেছে। এমনি কিছুদিন পরে যখন পাতা শুকাইয়া খড়খড় করে, ডাঁটা পাটকাঠির মত মট্‌মট্‌ করিয়া ভাঙা যায়, তখন ঐ শুকনা পাতা আর ডাঁটার ওজন লইলে দেখা যায় ওজন কমিয়া গিয়াছে। মাত্র দেড় পোয়া ওজন হইল।

বাকি আড়াই পোয়া জল ছিল, সূর্যের তাপে ধীরে ধীরে বাষ্প হইয়া উবিয়া গেল। কেবল পালং শাক নয়, অন্য অন্য টাটকা গাছপালাতেও জলের পরিমাণ এই রকমই। গাছপালার জলের বিশেষ দরকার আছে। মাটি হইতে শিকড়ের সাহায্যে গাছ রস টানিয়া লয়। গাছের খাদ্য জলে দ্রবিত থাকিলে তবে গাছ তাহা শরীরে চলাচল করাইতে পারে। জীবজন্তুরও জলের বড় দরকার। আমাদের শরীরের জল গ্রীষ্মকালে ঘামের আকারে শরীর হইতে বাহিরে আসে। বেশী ঘাম হইলে তখন তৃষ্ণা পায়, অর্থাৎ শরীরে জলের পরিমাণ কমিয়া যাওয়াতে শরীর জল চায়। রক্তও জলীয় পদার্থ। ইহার পরিমাণও শরীরে কম নয়। একজন লোকের ওজন দেড় মণ হইলে তাহার শরীরে রক্ত থাকে চার সের। রক্তের বেশীর ভাগই জল। রক্ত যদি তরল পদার্থ না হইত, তাহা হইলে সারা শরীরে রক্ত চলাচল সম্ভব হইত না। আবার দেখি জল ছাড়া শস্যাদিও জন্মায় না।

বিভিন্ন জায়গা হইতে জল পাওয়া যায়। মেঘ হইতে বৃষ্টির আকারে, শীতের দেশে তুষারের আকারে, আর স্থানে স্থানে মাঝে মাঝে শিলাবৃষ্টির আকারে জল পাওয়া যায়। মাটির বুকে জল পাওয়া যায়—খানা, ডোবা, পুকুর হইতে, হ্রদ ও নদী হইতে। আবার পাহাড়ের গায়ে ঝরণা হইতেও জল পাওয়া যায়। মাটির অনেক নীচে হইতেও গভীর গর্ত খুঁড়িয়া আমরা জল পাই। সে জল হইল কুয়া বা ইঁদারা বা নলকূপের জল। আর অফুরন্ত জল পাওয়া যায় সমুদ্র হইতে।

নদীর জল ঘোলা, পান করা চলে না। সমুদ্রের জল বড় নোন্‌তা, পান করা চলে না। সব কুয়ার জলের স্বাদও সমান হয় না। পুকুরের জলও অপরিষ্কার। নদীর জলে মিশিয়া আছে কাদা-মাটি, ভাসিয়া-চলা ছোটো খাটো পচা পাতা, গাছের ডাল-পালা। শুধু তাহাই নয়,

নদীর জলে অনেক রকম ময়লা গোলা অবস্থায় থাকে। এক বাটি নদীর জল লইয়া কাদামাটি ছাঁকিয়া লইলাম। তারপর সেই স্বচ্ছ জল গরম করিয়া টগবগ করিয়া ফুটাইয়া উবাইয়া দিলাম। সাদা সাদা গুঁড়া বাটিতে পড়িয়া রহিল। এইগুলি হইল ঐ জলে মিশ্রিত বিভিন্ন পদার্থ। বৃষ্টির জল স্বচ্ছ, নদীর জলের মত ঘোলাটে অপরিষ্কার নয়। বৃষ্টির জল এইভাবে বাটিতে লইয়া উবাইয়া দিলে কোন গুঁড়া পড়িয়া থাকে না। কারণ বৃষ্টির জল খুব শুদ্ধ। নদীর জলের চাইতে ঝরণার জল, কুয়ার জল অনেক ভাল। নদীর জলের মত ইহারা ঘোলাটে নয়। তবে ইহাতেও সাদা গুঁড়া গোলা থাকে। সমুদ্রের জল ঘোলাটে না হইলেও নুন ও অন্যান্য কতকগুলি কটু স্বাদের জিনিসে ভর্তি। এই সব জিনিস সমুদ্রের জলে বেশ অনেক পরিমাণে দ্রবিভ আছে।

তিন রকম অবস্থায় আমরা বিভিন্ন পদার্থকে দেখিতে পাই। জলকে তরল অবস্থায় দেখি। তারপর ঠাণ্ডা করিলে জমিয়া বরফ হইতে দেখি। তখন জলের কঠিন অবস্থা। আবার তাপ দিলে জল টগবগ করিয়া ফুটিয়া স্টিমে পরিণত হয়। তখন জলের গ্যাসীয় অবস্থা।

শীতকালে আমরা দেখিতে পাই পুকুর, নদী, সমুদ্রের উপর হইতে জলীয় বাষ্প ধীরে ধীরে কুয়াশার আকারে উপরে উঠিয়া আসিতেছে। সূর্যের তাপে জল ধীরে ধীরে বাষ্পে পরিণত হয়। একটা পিরিচে খানিক জল খোলা জায়গায় রাখিয়া দিলাম। কয়েক দিন পরে জল আর দেখা গেল না। জল উবিয়া গিয়াছে। তরল জল বাষ্প হইয়া বায়ুমণ্ডলে মিশিয়া গেল। পুকুর, নদী, সমুদ্রের বুক হইতেও এইভাবে বাষ্প বায়ুতে চালিত হইয়া উপরে উঠিতে থাকে। উঠিতে উঠিতে

এমন একটা ঠাণ্ডা জায়গায় আসিয়া পড়ে যখন আর উঠিলে বাষ্প অবস্থায় থাকিতে পারে না, জমিয়া তরল হইয়া যায়। বায়ুমণ্ডলের সেই রকম একটা ঠাণ্ডা উঁচু জায়গায় আসিয়া জলীয় বাষ্প খানিকটা ঠাণ্ডা পাইয়া ঘনীভূত ও অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলের বিন্দুতে পরিণত হয়। এই ক্ষুদ্র জলবিন্দুগুলি বাষ্পে মিশিয়া মেঘ আকারে শূন্যে ঝুলিতে থাকে। আরও ঠাণ্ডা পাইলে জলবিন্দুগুলি আয়তনে ও সংখ্যায় আরও বৃদ্ধি পায়। পরে বৃষ্টির আকারে মাটির দিকে জলের ধারা পড়িতে থাকে। যে দেশে বৃষ্টি পড়ে, সেই দেশের বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস কিছু পরিমাণে বৃষ্টির জলে দ্রবিত হইয়া যায়। ধূলা-বালিও মিশিয়া যায়। তারপর সেই জল মাটির বুকে আসিয়া পড়ে। মাটি তাহা শুষিয়া লয়। মাটিতে আছে খড়িমাটি। বিশুদ্ধ জলে খড়িমাটি গোলা যায় না। কিন্তু জলে কার্বন ডাইঅক্সাইড দ্রবিত থাকিলে খড়িমাটি অনায়াসে দ্রবিত হয়। সেই জলে খড়িমাটি দ্রবিত হইয়া গেল। ইহা সহজে পরীক্ষা করা যায়। একটি গ্লাসে অল্প পরিমানে চুনের জল লইলাম। তারপরে একটি খড়ের নল মুখে লইয়া চুনের জলে ভুড়ভুড়ি কাটিলাম। চুনের জল ঘোলাটে হইয়া খড়িমাটি তৈয়ারি হইল। ঐ ঘোলাটে জলে আরও অনেকক্ষণ ভুড়ভুড়ি কাটিলাম। জলে ক্রমশঃ কার্বন ডাইঅক্সাইড দ্রবিত হওয়ার জন্য খড়িমাটি ধীরে ধীরে ঐ জলে আবার দ্রবিত হইল। গেলাসের জল আর ঘোলা রহিল না, স্বচ্ছ হইয়া গেল। জল গরম করিলে জলে-গোলা কর্বন ডাইঅক্সাইড উবিয়া যায়। গেলাসের জল গরম করিলাম। কার্বন ডাইঅক্সাইড উবিয়া গেল। ব্যস, জল আবার ঘোলাটে হইয়া গেল। কার্বন ডাইঅক্সাইড না থাকায় সেই জলে আর খড়িমাটি গোলা অবস্থায় রহিল না, পৃথক হইয়া গেল।

মাটিতে পড়িয়া বৃষ্টির জল নির্ঝরিনী বা নদীর আকারে প্রবাহিত হইয়া শেষ পর্যন্ত মাটি হইতে খড়িমাটি ও অন্যান্য সব জিনিষ গুলিয়া লইয়া সমুদ্রে আসিয়া মিশিল। আবার নদী ও সমুদ্রের বুক হইতে সূর্যের তাপে জল উঠিল বাষ্পের আকারে। আবার বৃষ্টির জলরূপে পড়িল মাটিতে। এমনিভাবে বায়ুমণ্ডলের মেঘ আর ধরা পৃষ্ঠের নদনদী, নির্ঝরিনী, সমুদ্রে জলের পরিমাণ একই থাকিয়া যায়, বাড়ে বা কমে না।
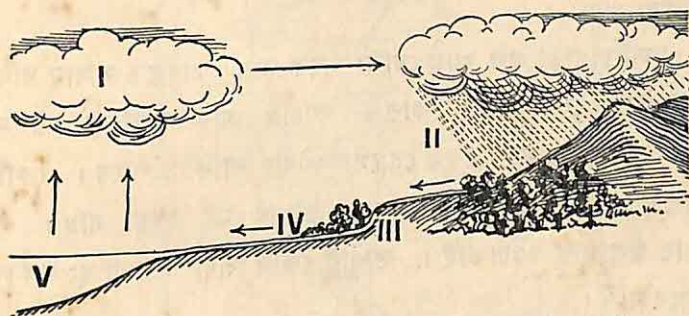
I. মেঘ, II. মেঘ হইতে বৃষ্টি, III. IV. জল ধরাপৃষ্ঠে প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে মিশিতেছে, V. সমুদ্র হইতে বাষ্প উঠিয়া মেঘ সৃষ্টি হইতেছে।

কাপড় কাচার জন্য, স্নান করার জন্য, ধোয়া-মোছা-পরিষ্কারের জন্য, পান করার জন্য আমরা প্রত্যহ জল ব্যবহার করিয়া থাকি। নদীর জল ঘোলা। কাপড় কাচার জন্য এই জল ব্যবহার করা চলে না, পান করাও যায় না। সমুদ্রের জল নোনতা। পান করা চলে না। সাবান কাচা চলে না। সমুদ্রের জলে সাবান গুলিলে একটুও ফেনা হয় না। দই-দই ছানা-ছানা ভাবে সাবান কেবল ক্ষয় হইয়া যায়। কুয়ার জলেও সাবান কাচা চলে না। সাবান ক্ষয় হয়

বেশী। অথচ কাপড় ধপধপে সাদা হয় না। কোন কোন পুকুরের জলেও তাই হয়।

জল শোধন: কাপড় কাচা, স্নান ও পান করা, এই সব কাজে যাহাতে ব্যবহার করা যায় সেইজন্য জল শোধনের ব্যবস্থা আছে। বালির স্তরে পারমিউটিট বলিয়া একটি পদার্থ মিশাইয়া দেওয়া হয়। ঐ স্তরের ভিতর দিয়া ঘোলা জল ধীরে ধীরে চুয়াইয়া পড়িলে কাদামাটি এমন কি জলে-গোলা খড়িমাটি পর্যন্ত ঐ স্তরে আটক থাকিয়া যায়।

চুয়াইয়া-পড়া জল আর ঘোলা থাকে না। তাহাতে সাবান ঘষিলে বেশ ভাল ফেনা হয়। কাপড় কাচার আর অসুবিধা হয় না। তবে এই জলেও নানা রকম রোগের জীবাণু থাকিতে পারে। ক্লোরিণ গ্যাস জলে মিশাইলে সব রকমের জীবাণু নষ্ট হইয়া যায়। পান করার জল স্বচ্ছ হওয়া চাই। তাহার কোন স্বাদ, গন্ধ বা রং থাকিলে চলিবে না।।

বিশুদ্ধ জলের কোন গন্ধ নাই। অল্প আয়তনে কোন রংও দেখা যায় না। তবে আয়তন খুব বেশী হইলে, বেশী গভীর হইলে জলের রং নীল দেখায়। যেমন, সমুদ্রের জলের রং লেখার কালির মত নীল-কালো মিশানো দেখায়।

জল জিনিষটা কি? তড়িতের সাহায্যে জল বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, তুই ভাগ হাইড্রোজেন গ্যাসের সঙ্গে এক ভাগ অক্সিজেন গ্যাস যুক্ত হইয়া জল উৎপন্ন হইয়াছে। হাইড্রোজেন গ্যাসে অগ্নি সংযোগ করিলে জল উৎপন্ন হয়। হাইড্রোজেন গ্যাস বায়ুর চাইতে হাল্কা। ইহাতে আগুন লাগিলে জ্বলিয়া উঠে। অক্সিজেন গ্যাস বায়ুতে না থাকিলে আগুন জ্বলে

না। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস যখন যুক্ত হইল তখন যে জিনিষটি পাওয়া গেল, সেইটি কিন্তু গ্যাস নয় ; তরল পদার্থ, বাতাসের চেয়ে অনেক ভারী। বিভিন্ন পদার্থ যুক্ত হইয়া উৎপন্ন হয় বলিয়া জলকে বলে যৌগিক পদার্থ।
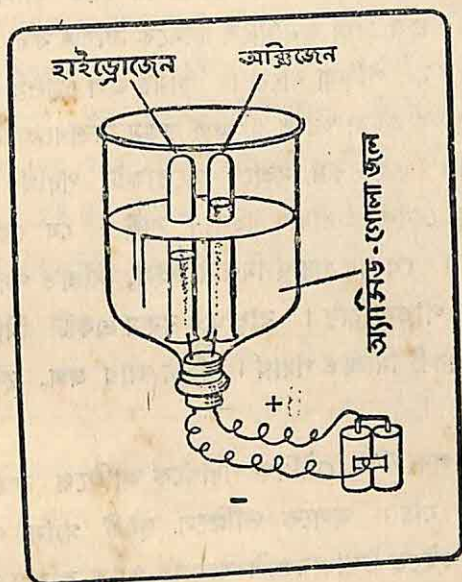
তড়িতের সাহায্যে জল বিশ্লেষণ

হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড জলে দ্রবিত করিয়া তাহাতে এক টুকরা লোহা ফেলিয়া দিলে হাইড্রোজেন গ্যাসের বুদবুদ বাহিরে আসিতে থাকে। হাইড্রোজেন গ্যাস জলের উপর উপুড় করা গ্যাস-জারে ধরা যায়। গ্যাস-জারের ভিতর যেমন হাইড্রোজেন বুদবুদ উঠিতে থাকে, অমনি ভিতরের জল নামিয়া আসিতে থাকে। কার্বন

ডাইঅক্সাইড গ্যাস তৈয়ারির ছবিটা দেখিলে গ্যাস সঞ্চয় করার প্রণালী বুঝা যাইবে।

মিশ্রিত পদার্থ : চিনি আর বালি মিশাইলাম। একেবারে নূতন কোন পদার্থ উৎপন্ন হইল না। চিনির স্বাদ পাওয়া গেল। বালিও মিশান আছে চোখে দেখা গেল। চিনির ধর্ম আর বালির ধর্ম দুই-ই বজায় রহিল। জল দিয়া অনায়াসে চিনিকে দ্রবিত করা চলে। বালি জলে দ্রবিত হয় না, পড়িয়া থাকে। চিনির জল ঢালিয়া লইলে চিনি হইতে বালি পৃথক হইয়া আসে। এই রকম মিশ্রণকে তাই যৌগিক পদার্থ বলি না। এই রকম মিশ্রণে প্রত্যেকটা পদার্থ কতটা লওয়া হইবে তাহার কোন বাঁধাধরা হিসাব নাই। যে কোন পরিমাণে লইলেই হইল। যে সব পদার্থ মিশান হইল, মিশ্রিত পদার্থে তাহাদের সকল গুণাগুণ পাওয়া যায়। বায়ু এই রকম একটি মিশ্রিত পদার্থ। চিনির রসও একটি মিশ্রিত পদার্থ। চিনি আর জল, দুইটি পদার্থের মিশ্রণ।

মৌলিক পদার্থ : যৌগিক পদার্থকে ভাঙ্গিলে কতকগুলি ভিন্ন পদার্থ পাওয়া যায়। জলকে ভাঙ্গিলে দুইটি গ্যাস পাওয়া যায়। মিশ্রিত পদার্থ হইতে উপাদানগুলি সহজেই পৃথক করিয়া লওয়া যায়। কিন্তু যৌগিক পদার্থ ভাঙ্গা তেমন সহজ নয়। পৃথিবীতে অনেক যৌগিক পদার্থ আছে। অনেক মিশ্রিত পদার্থও আছে। ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি পদার্থ আছে যাহাদের ভাঙ্গিয়া আর নূতন কোন পদার্থ পাওয়া যায় না। যেমন, সোনা, রূপা, তামা, লোহা। ইহাদের ভাঙ্গিলে অন্য কোন পদার্থ পাওয়া যায় না। ইহাদের বলে মৌলিক পদার্থ। পৃথিবীতে মৌলিক পদার্থের সংখ্যা মাত্র একশতর কাছাকাছি। ইহাদের সবগুলিই সোনা-রূপা ধাতুর মত কঠিন

পদার্থ নয়। পারদ হইল মৌলিক পদার্থ। ইহা ঢলঢলে তরল। আবার কতকগুলি গ্যাস আছে, যাহারা মৌলিক পদার্থ। যেমন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন। এই রকম আরও অনেক গ্যাস আছে। কতকগুলি মৌলিক পদার্থ যুক্ত হইলে তবে যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়। হাইড্রোজেন গ্যাস আর অক্সিজেন গ্যাস মিশাইয়া একটু আগুনের শিখা স্পর্শ করাইলাম। ব্যস, জোরে একটা শব্দ হইল, আর উৎপন্ন হইল জল। এখানে একটি কথা আছে। কতটা হাইড্রোজেন আর কতটা অক্সিজেন মিশাইব। দুই ভাগ হাইড্রোজেন আর এক ভাগ অক্সিজেন মিশাইয়া আগুন দিলে জল তৈয়ারি হইবে। যদি দুই ভাগ হাইড্রোজেন আর দুই ভাগ অক্সিজেন লই তাহা হইলে এক ভাগ অক্সিজেন খরচ হইবে, আর এক ভাগ পড়িয়া থাকিবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জীব

পৃথিবীর অনেকটা জুড়িয়া জল আছে। সারা পৃথিবীতে জলের পরিমাণ কম নয়। পৃথিবীকে যদি সমান চারি ভাগে ভাগ করি তাহা হইলে তাহার তিন ভাগ জলে ঢাকিয়া থাকিবে। পৃথিবীর উপরটা আবৃত করিয়া রাখিয়াছে এক বিস্তীর্ণ বায়ুমণ্ডল। লক্ষ লক্ষ বছরে এই পৃথিবীতে ক্রমে ক্রমে দেখা দিয়াছে উদ্ভিদ, কীটপতঙ্গ, পশুপাখী আর মানুষ।

পৃথিবীতে দুই শ্রেণীর পদার্থ আছে বলা চলে, জীব আর জড়। বলা যাইতে পারে, যাহা ছোট হইতে ধীরে ধীরে বড় হয় তাহা জীব। আর যাহা বড় হয় না তাহা জড়। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় জড়ও বড় হয়। যেমন চিনির রসের ভিতর একটি চিনির দানা সূতা দিয়া বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দেওয়া হইল। দেখা গেল, দানাটা ক্রমশঃ বড় হইতেছে। গাছ বাড়ে, শিশুও বড় হয়। চিনির দানাও বড় হইল। অথচ চিনির দানাকে জীব বলি না। বলি, জড়। গাছ আর শিশু হইল জীব। জীব বলিব তাহাকে, যে বড় হইতে পারিবে। শ্বাস লইতে পারিবে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাড়া-চাড়া করিতে পারিবে। বাহিরের সঙ্গে খাপ খাইয়া বাঁচিতে পারিবে। বংশ বৃদ্ধি করিতে পারিবে। এ সব যে পারিবে না তাহাকে বলিব জড়। চিনির দানা বড় হয় বটে, কিন্তু বাকী কাজ সে করে না। তাই তাহাকে জীব বলি না। গাছ-পালা, কীটপতঙ্গ, পশু-পাখী, জন্তুজানোয়ার, মানুষ এ সব পারে, তাই ইহাদের বলি জীব।

যখন পৃথিবীতে জমি, পাহাড়, গাছপালা, জন্তুজানোয়ার কিছুই ছিল না, তখন ছিল কেবল জল। তারপর জলের বুকে জমি-পাহাড় সব মাথা উঁচু করিয়া উঠিল। সূর্যকিরণের কারসাজিতে জলের বুকে জীব দেখা দিল। জল ছিল বলিয়া ভাসিতে লাগিল, জন্মিল কি করিয়া? কেহ তাহা জানে না। প্রথম যে-জীব দেখা দিল, সে হইল থলথলে একটু পদার্থ। সেইটি জলের উপরে নানা রূপ ধরিয়া ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। কখনও তাহার আকার হইল গোল, কখনও তিনকোণা, কখনও বা যেমন-তেমন একটা আকার। প্রত্যেক জীবকে আহার সংগ্রহ করিতে হইবে। না খাইলে সে বাঁচিবে কি করিয়া? বাড়িবেই বা কেন? তাই তাহার এক জায়গায় স্থির হইয়া থাকা চলে না। থাকিলেই সেখানকার খাবার ত শীঘ্রই ফুরাইয়া যাইবে। প্রথম যে জীব জলে দেখা দিল, তাহার শরীরের এমন ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিল যাহাতে নানা জায়গা হইতে সে খাবার যোগাড় করিতে পারে। আর পলাইয়া শত্রুর মুখ হইতে নিজেকে বাঁচাইতে পারে। জলে চলাফেরা করিবার উপযুক্ত শরীর তাহার গড়িয়া উঠিল। কিন্তু সূর্যের তাপে যে শরীর জ্বলিয়া যায়। তাপ হইতে বাঁচিবার আবরণ চাই। আমরা ব্যবহার করি ছাতা। চোখ বাঁচাইতে পরি রঙিন চশমা। তেমনি নিজেদের রক্ষা করিবার জন্য নানা রঙের আবরণ এ সব জীবের গায়ে গড়িয়া উঠিল। সবুজ রংয়ের আবরণ যাহাদের গায়ে আসিল, তাহারা পরে উদ্ভিদে পরিণত হইল। তাহাদের দেহে শক্ত ছাল দেখা দিল। বাহিরের উপদ্রব হইতে তাহারা অনেকটা রক্ষা পাইল। বায়ু হইতে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস লইয়া সূর্যের আলো পাইয়া তাহারা তাহাদের পাতার সবুজ রংয়ের সাহায্যে নিজেদের খাবার তৈয়ারি করিল। আর যাহারা এই ভাবে নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারিল না, তাহারা

উদ্ভিদ খাইয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিল। ইহারা হইল প্রাণী। এইভাবে জীব দুই শ্রেণীতে ভাগ হইয়া গেল, উদ্ভিদ আর প্রাণী।

ক্রমে প্রাণীর পাকস্থলী জন্মিল। হজমের ব্যবস্থা হইল। শ্বাসপ্রশ্বাস চলাচলের পথ তৈয়ারি হইল। ফুসফুস গড়িয়া উঠিল। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনা করিবার জন্য মস্তিষ্ক আর নার্ভ দেখা দিল। চোখ-কানের উদ্ভব হইল। প্রাণী আর কেবল জলে বাস করিল না। জল আর স্থলে উভচর হইয়া বাস করিতে লাগিল। আরও পরে কতক প্রাণী কেবল স্থলচর হইয়া গেল।
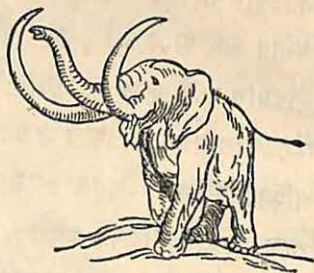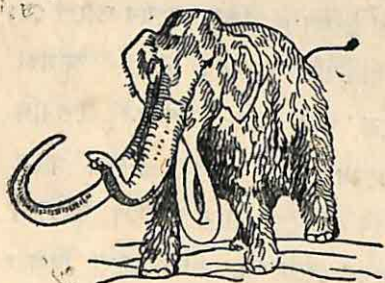
সেকালের জানোয়ার

নানা রকমের গাছপালা গড়িয়া উঠিল। জল ছাড়িয়া মাটিতে উদ্ভিদ জন্মিতে লাগিল। গাছ আর প্রাণীর মত চলাফেরা করিতে পারিল না। তবে তাহারা বাঁচিল, বাড়িল, ডালপালা ছড়াইল,

পাতা বাহির করিল, কুঁড়ি ধরাইল। তাহাদের ফুল ফুটিল, ফল ধরিল। ফল হইতে বীজ আসিল, আবার বাজ হইতে গাছ জন্মিল।

পৃথিবীতে জীব প্রথম দেখা দিল প্রায় পঞ্চাশ কোটি বছর আগে। মাছ আসিল চল্লিশ কোটি বছর আগে। পাখী আসিল দশ হইতে পনের কোটি বছর আগে, আর মানুষ জন্মিয়াছে প্রায় দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার হইতে তিন লক্ষ বছর আগে।

সেকালের জানোয়ার

মানুষ গড়িয়া উঠিল জীবের অনেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়া। সেই সব চেয়ে পুরাতন থক্‌থকে থল্‌থলে জীব-কণা হইতে কোটি কোটি বছরের বিস্ময়কর পরিবর্তনের ভিতর দিয়া জীব মানুষের রূপ লইল। যে প্রাণী ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইয়া মানুষের আকার লইল সে ছিল বানর জাতীয়।

সেকালের জানোয়ার

গাছপালা আর জীবজন্তুর আদান-প্রদান : আমাদের খাদ্য চাল, দাল, আটা, ময়দা সবই আমরা পাই উদ্ভিদ হইতে। এমন কি, আলু, পটোল, কপি, বেগুন, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি শাকসব্জী সবই উদ্ভিদের দান। লঙ্কা, হলুদ, সরিষা, ধনে, জিরা, মরিচ, আদা, পিঁয়াজ সবই গাছপালা হইতে সংগ্রহ করি। বলিতে গেলে, সরিষার তেল,

নারিকেল তেল, রেড়ির তেল, চিনি, গুড়, আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, সবই আমরা উদ্ভিদ হইতে পাই। এমন কি সাগু, বার্লি, চা সবই। কত রকম ঔষধপত্র গাছ-গাছড়া হইতে পাই। ম্যালেরিয়ার ঔষধ কুইনিন ও সিনকোনা গাছের ছাল হইতে তৈয়ারি।

রান্না করার কয়লা ও কাঠ, গাড়ী চালাইবার পেট্রল, বাতি জ্বালাইবার কেরোসিন সবই আসিতেছে মূলতঃ সেই উদ্ভিদ হইতে। বিছানার তুলা, কাগজের ঘাস, দর্মার বাঁশ, আসবাব পত্রের কাঠ, জামাকাপড়ের সূতা সবই ত গাছপালা হইতে আসে।

যদি মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, মাখন খাইয়া থাকি তাহা হইলে ত আর উদ্ভিদের মুখ চাহিয়া আমাদের থাকিতে হইবে না। কিন্তু মাছ যে বাঁচে-বাড়ে শ্যাওলা, ঝাঁঝি খাইয়া। সেগুলি ত উদ্ভিদ। ছাগল-ভেড়া জীবন ধারণ করে ঘাস খাইয়া। ঘাসও ত উদ্ভিদ। হাঁস-মুরগী ডিম দেয়, খায় ভাত, চাল-দাল। গরু দুধ দেয়, খায় গাছের ডালপালা, খড়, বিচালি, ভুসি, সবই উদ্ভিদজাত। তাই ভাবিয়া দেখিলে বলিতে হয় উদ্ভিদের কাছে আমরা নানাভাবে ঋণী।

কিন্তু এ কথাও ঠিক উদ্ভিদেরও প্রাণী না হইলে চলে না। গোবর-চোনার সার না দিলে ভাল ফসল হয় না। জন্তুর হাড়ের গুড়াও খুব ভাল সার। প্রাণী না থাকিলে উদ্ভিদরাও ভাল খাদ্য পাইত না। এইভাবে দেখা যায়, উদ্ভিদের কাছে প্রাণী যেমন ঋণী, প্রাণীর কাছে উদ্ভিদও তেমনি ঋণী।

উদ্ভিদ ও প্রাণী ঃ খুব ছোট উদ্ভিদ আর খুব ছোট প্রাণী চোখে দেখা যায় না। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ছোটকে অনেকগুন বড় করিয়া দেখা যায়। খুব ছোট জীবাণু, ব্যাঙের ছাতা, শ্যাওলা, কচুরি-পানা, শালুক, ধান, আক, গাঁদা, বট, অশথ সব উদ্ভিদ, আর অ্যামিবা

নামে খুব ছোট জল-জীব, স্পঞ্জ, প্রবাল কীট, পতঙ্গ, শামুক, মাছ, টিকটিকি, ব্যাঙ, পাখী, উট, বানর, মানুষ সব হইল প্রাণী।

খুব ছোট উদ্ভিদ আর খুব ছোট প্রাণী জলের মধ্যে নড়িয়া চড়িয়া বেড়ায়। অণুবীক্ষণের সাহায্যে দেখা যায় তাহারা জলে নড়িয়া বেড়াইতেছে। ইহাদের হাত-পা নাই। প্রাণী এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় চলিয়া যাইতে পারে। উদ্ভিদ তাহা পারে না। স্পঞ্জ আর প্রবাল প্রাণী বটে, কিন্তু চলিতে পারে না। শ্যাওলা যদিও উদ্ভিদ, তবুও জলে ভাসিয়া ভাসিয়া খাদ্য সংগ্রহ করে। উদ্ভিদ বায়ু হইতে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস শুষিয়া লয়। তাহার সবুজ রং আর সূর্যের আলোর সাহায্যে কার্বন ডাইঅক্সাইড হইতে কার্বনের অংশ সে নিজের শরীর গঠনের জন্য কাজে লাগায়। অক্সিজেন গ্যাস আবার বায়ুতে ত্যাগ করে। প্রাণী ঠিক তাহার উলটা কাজ করে। বায়ু হইতে সে অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করে। আর কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস বায়ুমণ্ডলে ত্যাগ করে।

উদ্ভিদের মধ্যে কতকগুলির ফুল বা বীজ হয় না। শ্যাওলার ফুল হয় না। সীম, মটর, আম সবেরই আবার ফুল আর তাহা হইতে ফল হয়।

মাছ, ব্যাঙ, টিকটিকি, সাপ, পাখী, বাঘ, বানর, মানুষ এ সব প্রাণী-দের শিরদাঁড়া আছে। আবার চিংড়ি, কাঁকড়া, মশা, মাছি, প্রজাপতি, শামুক, গুগ্‌লি, কেঁচো প্রভৃতি প্রাণীর শিরদাঁড়া নাই। শরীরে হাড়ও নাই। কতকগুলি প্রাণী কেবল জলে বাস করে। ডাঙায় উঠিলে একটু পরেই মরিয়া যায়। রুই, কাতলা প্রভৃতি মাছ জল ছাড়া বাঁচে না। আবার কতকগুলি আছে যাহারা জলে আর ডাঙায় দুই জায়গাতেই চলিয়া বেড়াইতে পারে। কুমীর আর কচ্ছপ তাই করে। জলে
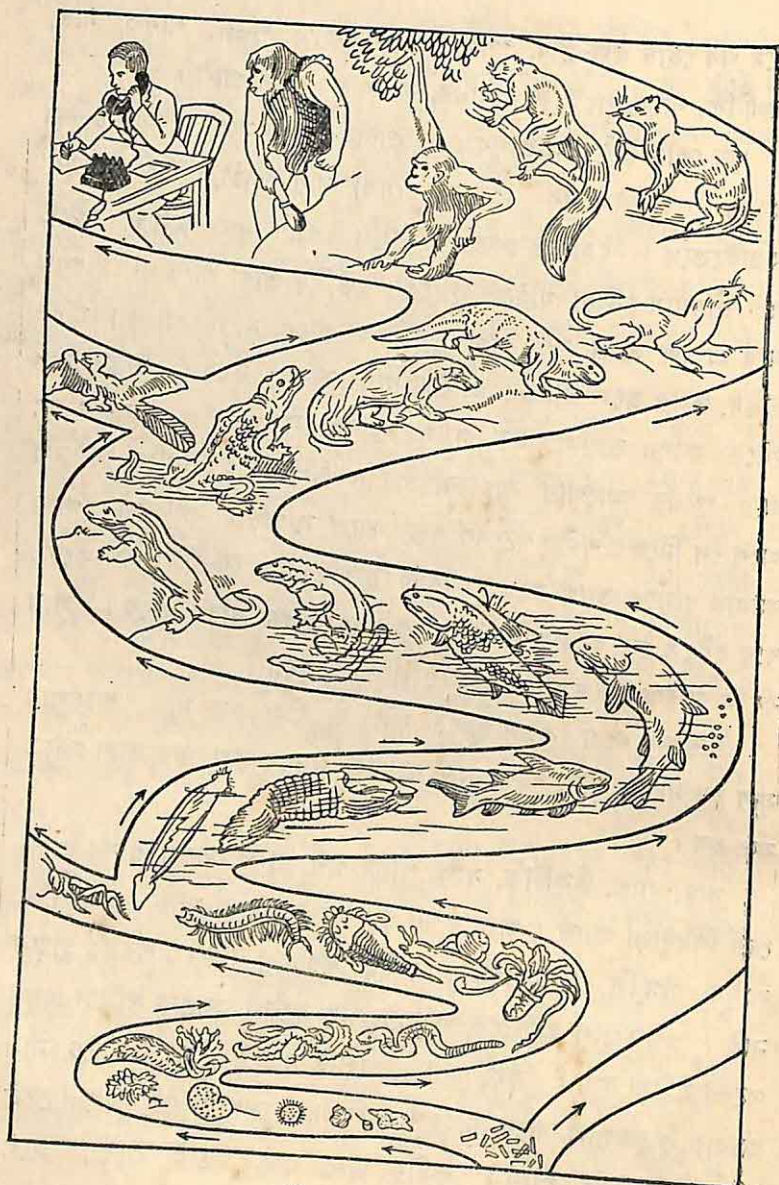
জীবজন্তুর ক্রমবিকাশ

সাঁতার দিতে পারে, আবার ডাঙায় আসিয়া রোদ পোহাইতেও পারে। বেশীর ভাগ প্রাণী কেবল স্থলে বাস করে। ঈগল, শকুনি, চিল আকাশে খুব উঁচু অবাধ উড়িতে পারে, তবে বাস করে পাহাড়ের উপর কিম্বা গাছের শাখায়। এমনি ধারা উদ্ভিদ ও প্রাণীজগৎ যে কত বিশাল, কত বিচিত্র তাহা তোমরা যত পড়িবে তত জানিতে পারিবে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জলবায়ু, বিভিন্ন তাহার জীবজন্তু, গাছপালা। বিজ্ঞানীরা অনেক অধ্যবসায়, অনেক সহিষ্ণুতা, অনেক ধৈর্য ধরিয়া তবে তাহাদের বিষয় জানিতে পারিয়াছেন। একজনের কথা বলি।

ফেবার

সেই সকাল হইতে একজন একটি ছোট নদীর ধারে একখানা পাথরের উপর চুপ করিয়া বসিয়া কি যেন দেখিতেছে। চাষার মেয়েরা সকালে কাজে যাইবার সময় দেখিল লোকটি বসিয়া আছে। আবার সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফেরার পথে দেখিল লোকটি তেমনি চুপ করিয়া বসিয়া আছে। বিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিদ ফেবার এই ভাবে দিনের পর দিন বিভিন্ন পোকার জীবনযাত্রা লক্ষ্য করিতেন। পোকামাকড়ের বিষয় অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়া ইনি যশস্বী হইয়াছেন।

হুকার

ভারতবর্ষে কত বিচিত্র রকমের গাছ-পালা আছে। ইহার তথ্য সংগ্রহ করেন স্যর জোসেফ হুকার। তিনি এদেশে আসিয়া দুর্গম বনজঙ্গলে মাসের পর মাস

কাটান। কত পোকার কামড়, কত হিংস্র জন্তুর আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়া, কত অসুখ ভোগ ধরিয়া, ধৈর্য করিয়া তিনি বিভিন্ন গাছপালা সংগ্রহ করেন। পদব্রজে তিনি সব হিমালয় অঞ্চল ঘুরিয়া বেড়ান। কোন সময় দড়ি ধরিয়া ঝুলিয়া নামেন একটি ছোট ঘাসফুলের চারা সংগ্রহ করিতে, কখনও জীবন বিপন্ন করিয়া চলেন পাহাড়ের শ্যাওলা ধরা বুকে ফোটা ফুল তুলিতে। শীত-বর্ষা-গ্রীষ্ম কাটাইয়া মাসের পর মাস থাকার কষ্ট, পথ চলার কষ্ট সহ্য করিয়া পরম অধ্যবসায় সহকারে তিনি কত সব বিচিত্র গাছপালা, ফুলফলের নমুনা সংগ্রহ করেন। কোন্ দেশে কোন্ গাছ জন্মায়, কোন্ ঋতুতে কোন্ ফুল ফোটে, কোন্ সময়ে তাহার ফল ধরে, এসব তথ্য তিনি লিপিবদ্ধ করেন। এমনি বহু পরিশ্রম করিয়া আমাদের দেশের সব উদ্ভিদের জ্ঞান জনসমাজকে তিনি দিয়া যান।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র

ভোরবেলা দেখি প্রকাণ্ড থালার মত সূর্য আকাশের এক প্রান্ত হইতে ধীরে ধীরে উঠে। ঠিক দুপুরে আকাশের মাঝখানে আসিয়া পৌঁছায়। আবার ধীরে ধীরে আকাশের আর এক প্রান্তে ঢলিয়া পড়ে। দিনের আলোয় ইহা ছাড়া আর কিছু আকাশে আছে বলিয়া চোখে পড়ে না।

সন্ধ্যায় পৃথিবীর উপর অন্ধকার নামে। আকাশে তখন দেখি অসংখ্য আলোর বিন্দু দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহারা সব নক্ষত্র। মেঘ না থাকিলে আকাশ জুড়িয়া, হাজার হাজার উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা যায়। ইহাদের উজ্জ্বলতার তফাৎ চোখে পড়ে। ইহারা কিন্তু আকাশের গায়ে যেমন-তেমন ভাবে ছড়াইয়া নাই। মানুষ অনেক কাল আগেই ছড়ান নক্ষত্রগুলির ভিতর পাশাপাশি কতকগুলিকে ধরিয়া সিংহ, মেষ, কুকুর, বিছা প্রভৃতি জীবজন্তুর চেহারার সাদৃশ্য কল্পনা করিয়াছিল। এই সব কল্পনা করা চেহারার খোঁজ করিয়া আমরা আজও এই সব নক্ষত্রের অবস্থান স্থির করিয়া থাকি।

পৃথিবী স্থির নয়। তাহার গতি হইতেই সূর্য আর অন্য সব নক্ষত্র আকাশে চলিতেছে বলিয়া মনে হয়। কোপার্নিকাস বলিয়াছিলেন পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। গ্যালিলিও ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে দূরবীন তৈয়ারি করিয়া কয়েকটি গ্রহের গতি পরীক্ষা করেন। তিনিও দেখিলেন, পৃথিবী ও অন্য অন্য গ্রহ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া ঘুরিতেছে।
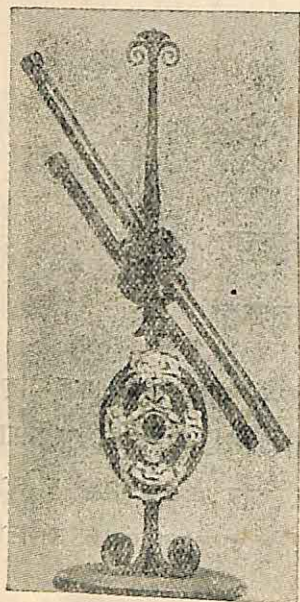
গ্যালিলিওর দূরবীন

চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র এগুলি কি জিনিস? ইহাদের সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহল অনেক দিনের। আমরা ইহাদের সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারিয়াছি। তাহারই কিছু তোমাদের বলিতেছি।

চন্দ্র

চাঁদ আমাদের কাছ হইতে অনেক দূরে। কত দূরে? এক শত দুই শত মাইল? না, তার চাইতে আরও অনেক দূরে। এত দূরে যে ঠিক আন্দাজ করা যায় না। আমাদের কাছ হইতে চাঁদ দুই লক্ষ উনচল্লিশ হাজার মাইল দূরে রহিয়াছে।

জ্যোৎস্না ঃ চাঁদের নিজের বলিতে কোন আলো নাই। পূর্ণিমার রাতের যে আলো, তাহা কোথা হইতে আসে? তাহা কি চাঁদের আলো নয়? না, তাহা সূর্যের আলো।

ঘরের কোণে প্রদীপ জ্বলিতেছে। প্রদীপ হইতে আলো চারিপাশে ছড়াইয়া পড়িতেছে। সেই আলোতে দেখি ঘরের ভিতরের জিনিসপত্র। জিনিসপত্র দেখি প্রদীপের আলোতে, ইহাদের নিজেদের কোন আলো
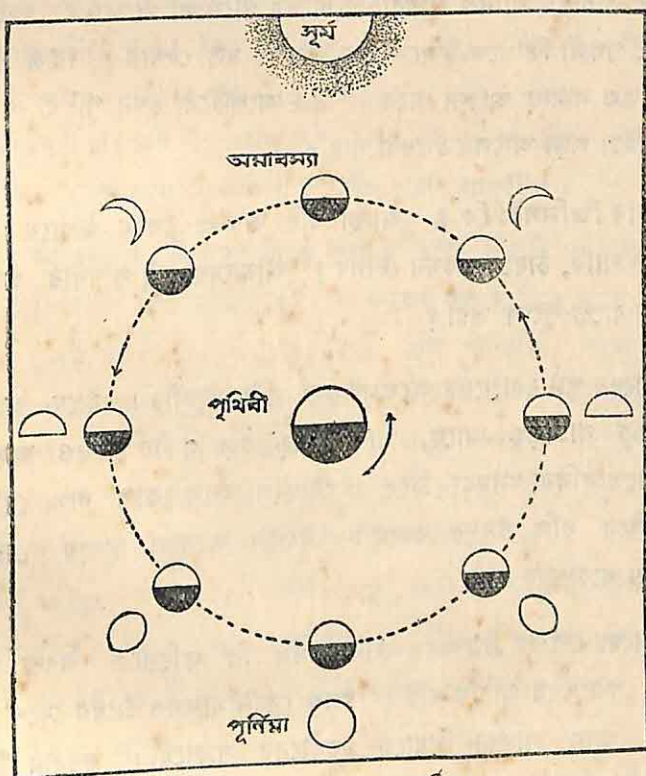
চন্দ্রকলা—অমাবস্যা ও পূর্ণিমা

নাই। প্রদীপের আলো জিনিসপত্রের গায়ে লাগিয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে। সূর্য হইতে চারিদিকে আলো বাহির হইতেছে। তাহার খানিক চাঁদের গায়ে আসিয়া লাগিতেছে। লাগিতেছে আর ছড়াইয়া

পড়িতেছে। আবার তাহারই খানিক পৃথিবীতে আসিয়া পৌঁছিতেছে। তাহাকেই বলে জ্যোৎস্না।

তেমনি আবার সূর্যের আলো পৃথিবীর গায়ে আসিয়া পড়িতেছে। আবার তাহারই খানিক ঠিকরাইয়া চাঁদের গায়ে লাগিতেছে। তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী তিথিতে চাঁদকে সরু কাস্তের মত দেখায়। কিন্তু বাকী অংশতেও সামান্য আলো থাকে। এই অংশটিকে তখন পৃথিবী হইতে ঠিকরাইয়া পড়া আলোতে দেখা যায়।

চাঁদ জিনিসটা কি? আচ্ছা যদি কখনও কোন উপায়ে চাঁদে যাইতে পারি, চাঁদকে কেমন দেখিব? আমাদের এই পৃথিবীর মতনই কি ধন-ধান্যে-পুষ্পে ভরা?

চাঁদের পৃষ্ঠ ধরাপৃষ্ঠের অপেক্ষা ঢের বেশী উঁচুনীচু। চাঁদে অনেক উঁচু উঁচু পাহাড়ও আছে, আবার বড় বড় গভীর খাদও আছে। পৃথিবীতে বসিয়া আমরা চাঁদে কতকগুলি কাল কাল দাগ দেখি। সেগুলিকে বলি চাঁদের কলঙ্ক। ঐগুলি আসলে চাঁদের দেশের বড় বড় পাহাড়ের ছায়া।

চাঁদের দেশের এত খবর জানা গেল কি করিয়া? অবশ্য চাঁদ হইতে কেহ খবর পাঠায় নাই। আর কোন মানুষও চাঁদের দেশে যায় নাই। খবর পাওয়া গিয়াছে দূরবীনের সাহায্যে। দূরবীন দিয়া দেখিলে অনেক দূরের জিনিস বড় হইয়া কাছে আছে বলিয়া মনে হয়।

চাঁদের যে অংশটা সূর্যের দিকে মুখ করিয়া আছে, সে দিকটা খুবই গরম। আর যে অংশটা সূর্য হইতে দূরে সে দিকের সব দেশে

কনকনে ঠাণ্ডা। সে অংশে জল নাই। এমন কি বায়ু পর্যন্ত নাই। তাই মনে হয় গাছপালা, জীবজন্তু চাঁদে থাকা সম্ভব নয়।

চাঁদ পৃথিবীর অপেক্ষা অনেক ছোট। পৃথিবী বড় বলিয়া পৃথিবীতে-থাকা জিনিসপত্রের উপর পৃথিবীর টান বেশী। চাঁদ ছোট বলিয়া চাঁদে-থাকা জিনিসপত্রের উপর চাঁদের টান পৃথিবীর টানের চাইতে কম। ইহার জন্য ভারী একটা মজা হইতে পারে। যে ছেলেটি পৃথিবীতে চার ফুট উঁচু পর্যন্ত লাফ দিতে পারে, সে চাঁদে গিয়া লাফ দিল। দেখা গেল সে চব্বিশ ফুট উঁচু অবধি লাফাইল।

অভিকর্ষ ঃ উপরের দিকে ঢিল ছুঁড়িলে ঢিলটি খানিক উঁচুতে উঠিয়া আবার নীচে নামিয়া আসে। গাছের ফল মাটিতে পড়ে। পৃথিবী যেন একটা খুব বড় গোলকের মত। ঢিল পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে পড়িতেছে, ফলও গাছ হইতে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে পড়িতেছে। যে কোন জিনিসই উপর হইতে পড়িবার সময় পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে পড়িতেছে। নিউটন বলিয়াছিলেন, উপর হইতে নীচে জিনিস পড়ে পৃথিবী তাহার কেন্দ্রের দিকে জিনিসটিকে টানে বলিয়া। এই টানকে বলে অভিকর্ষ। কেবল পৃথিবী নয়, প্রতিটি গ্রহ প্রতিটি গ্রহকে টানিতেছে। সূর্য তাহার চারি পাশে ঘুরিয়া-চলা গ্রহদের টানিতেছে। চাঁদ পৃথিবীকে টানিতেছে। দুইটি জিনিসের পরস্পর টানকে নিউটন নাম দিলেন অভিক ।

জোয়ার-ভাঁটা ঃ পৃথিবী চাঁদকে টানে। চাঁদও পৃথিবীকে টানে। রোজই টানে, সব সময়ে টানে। চাঁদের টানে পৃথিবীর সমুদ্রে জোয়ার-ভাঁটা খেলে। অমাবস্যা আর পূর্ণিমার সময় চাঁদ পৃথিবীর সমুদ্রের জলকে টানিল। সমুদ্রে জোয়ার আসিল। যখন টান

কমিল তখন ভাঁটা পড়িল। সমুদ্রের সঙ্গে নদীর যোগ আছে। তাই নদীর জলেও জোয়ার-ভাঁটা খেলে। জোয়ারের সময় নদীর জল কিনারায় অনেক দূর অবধি উঠিয়া আসে। আবার ভাঁটার সময়
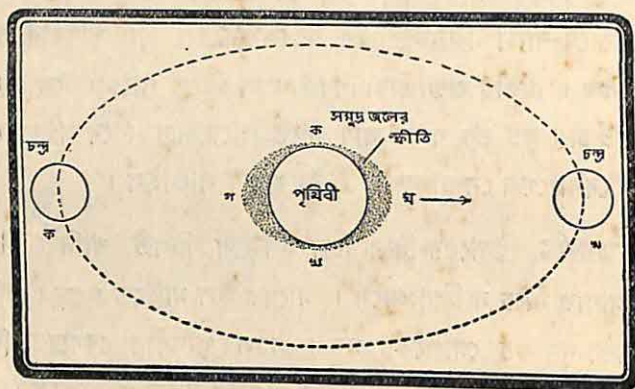
জোয়ার ভাটা

অনেক নীচে নামিয়া যায়। নদী বা সমুদ্রের জলে জোয়ার-ভাঁটা রোজই খেলে। তবে অমাবস্যা আর পূর্ণিমার সময় জোয়ার-ভাঁটা একটু বেশী রকম দেখা যায়।

সূর্য

আকাশে যে সব সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্র দেখিতেছি তাহাদের মধ্যে চাঁদ পৃথিবী হইতে সব চেয়ে কাছে রহিয়াছে। কাছে মানে এ-পাড়া ও-পাড়া নয়। চাঁদ পৃথিবী হইতে দুই লক্ষ উনচল্লিশ হাজার মাইল দূরে আছে। কিন্তু সূর্য যে আরও অনেক দূরে রহিয়াছে। নয় কোটি

তিরিশ লক্ষ মাইল দূরে। এত দূর যে আন্দাজ পাওয়া যায় না। উড়োজাহাজ চলিয়াছে ঘণ্টায় তিন শত মাইল বেগে। তাহাতে চড়িয়া বসিলাম। উড়োজাহাজ কেবল চলিতেছে, একবারও থামিতেছে না। তাহার বেগও কমিতেছে না, বাড়িতেছে না। কখন সূর্যে পৌঁছাইব? পৌঁছাইব পঁয়ত্রিশ বছর পরে।
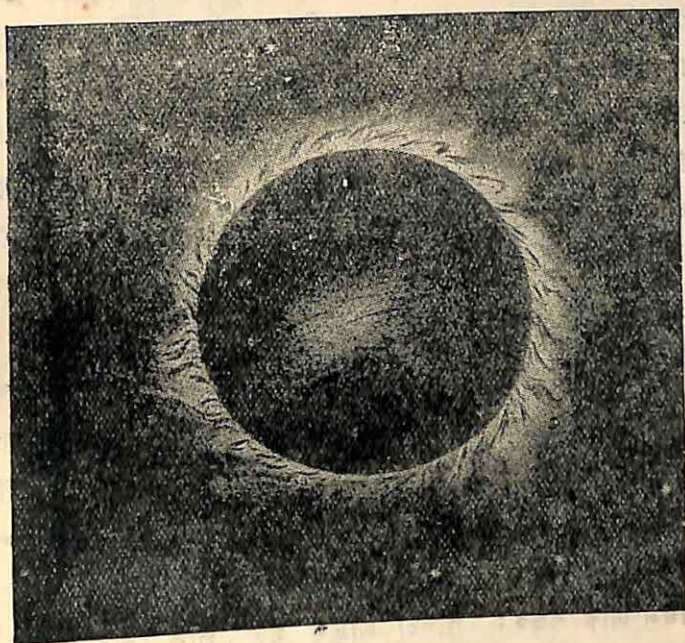
সূর্যের চারিধার দূরবীনে যেমন দেখায়

সূর্য কি? পৃথিবী কাদা-মাটি-পাথর দিয়া গড়া। সূর্যের উপাদান কিন্তু সবই গ্যাস অবস্থায়। সূর্য একটি গ্যাসের পিণ্ড। দীপ্ত গ্যাসের পিণ্ড। কেবল তাপ আর আলো ছড়াইতেছে। সূর্য পৃথিবীর

অপেক্ষা অনেক বড়। তের লক্ষ গুণ বড়। পৃথিবী ঘুরিয়া একখানি ট্রেন আসিতে যদি একুশ দিন লাগে, তাহা হইলে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে তাহার লাগিবে সাত বৎসর।

জ্বলন্ত উনানের কাছে দাঁড়াইলে তাপ লাগে। দূরে সরিয়া গেলে তাপ কম লাগে। হাপর দিয়া গনগনে আগুন করা বড় চুলার কাছে তাপ বেশী লাগে। রান্না-করার ছোট উনানের তাপের চাইতে বেশী তাপ লাগে। ক্রমশঃ দূরে সরিয়া আসিলে তাপ ক্রমে কম লাগে। বৈশাখ মাসের দুপুরের রৌদ্রে দাঁড়াইলে প্রচণ্ড তাপ লাগে। সূর্য হইতে আমরা আছি নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল দূরে, তাহাতেও এত তাপ লাগে, তাহা হইলে সূর্যে কত প্রচণ্ড তাপ ভাব। পৃথিবীতে যতখানি সূর্যের তাপ আসিয়া পৌঁছাইতেছে তাহা যদি এক জায়গায় আসিয়া জমিত তাহা হইলে দশ লক্ষ মণ জলকে এক মিনিটে টগবগ করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে পারিত।

সূর্যে গ্যাস ভর্তি হইয়া আছে, দীপ্তিমান গ্যাস। তাহার খর তাপ আর চোখ ঝলসানো আলো ছড়াইয়া পড়িতেছে। বহু কোটি বছর ধরিয়া সূর্য তাপ আর আলো দিয়া আসিতেছে। ইহার শেষ আজও হয় নাই। আরও কোটি কোটি বছরেও ইহার শেষ হইবে না।

দিন আর বছর ঃ পৃথিবী লাট্টুর মত পাক খাইয়া খাইয়া ঘুরিতেছে। এক জায়গায় দাঁড়াইয়া পাক খাইতেছে না। পাক খাইতে খাইতে আবার সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। লাট্টুর মত একবার পাক খাইতে পৃথিবীর যে সময় লাগে তাহাকে বলে এক দিন। সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে পৃথিবীর লাগে ৩৬৫$\frac{১}{৪}$ দিন।

গ্রহ

আমাদের পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। পৃথিবীকে বলা হয় সূর্যের গ্রহ। পৃথিবী ছাড়াও আর কয়েকটি গ্রহ সূর্যকে ঘিরিয়া
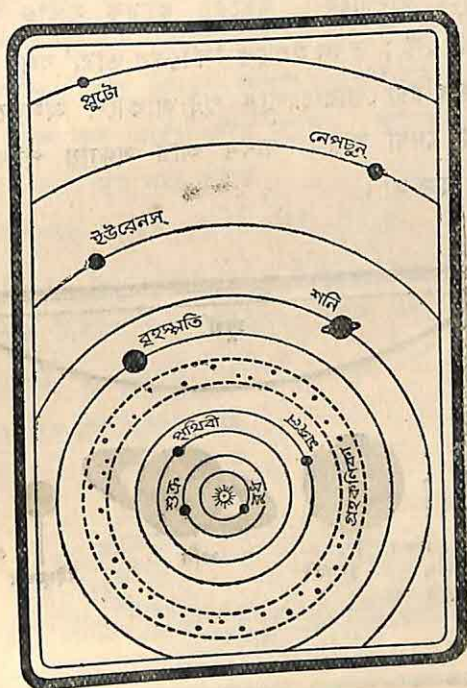
গ্রহগুলি পর পর যেমন আছে

ঘুরিয়া চলিতেছে। ইহাদেরও চাঁদের মত নিজের কোন আলো নাই। সূর্যের আলো এই সব গ্রহতে পড়িতেছে, তারপর ছড়াইয়া যাইতেছে। তাহারই খানিক পৃথিবীতে আসিয়া পৌঁছাইতেছে। সেই আলোতে তাহাদের আমরা দেখিতে পাইতেছি।

বুধ ঃ সূর্যের সব চেয়ে কাছের গ্রহ হইল বুধ। সবচেয়ে কাছে হইলেও তিন কোটি ষাট লক্ষ মাইল দূরে। সূর্য অস্ত যাইবার একটু পরেই বুধ গ্রহকে আর দেখা যায় না।

শুক্র ঃ বুধের পরেই শুক্র গ্রহ। সূর্য হইতে ছয় কোটি সত্তর লক্ষ মাইল দূরে রহিয়াছে। বছরের কয়েক সপ্তাহ ইহাকে পশ্চিম আকাশে দেখা যায় ; তখন ইহাকে 'সাঁঝের তারা' বলা হয়। আবার কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া ভোর বেলায় পূর্ব আকাশে জ্বলজ্বলে 'শুকতারা' রূপে ইহাকে দেখা যায়। তখন আর সন্ধ্যায় পশ্চিমের আকাশে ইহাকে দেখা যায় না।
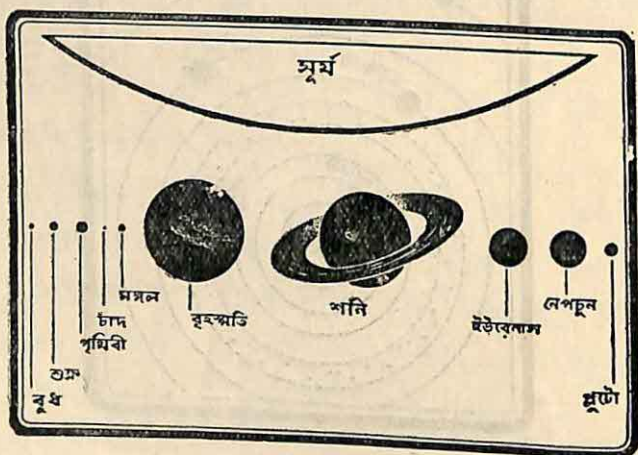
সূর্যের তুলনায় গ্রহগুলির আয়তন

মঙ্গল ঃ শুক্রের পর আমাদের পৃথিবী। তারপর মঙ্গল। মঙ্গলের পর কতকগুলি খুব ছোট ছোট টুকরা গ্রহের সমষ্টি, ইহাদের বলে গ্রহ কণিকা। ইহাদের সংখ্যাও কম নয়, প্রায় দেড় হাজার।

ইহাদের পর বৃহস্পতি। মঙ্গল গ্রহ দুই বছর পর পর পৃথিবীর খুব কাছে আসে। সেই সময় ইহাকে বড় লালচে জ্বলজ্বলে গ্রহ বলিয়া চেনা যায়।

বৃহস্পতি ও শনিঃ গ্রহদের মধ্যে বৃহস্পতি সবচেয়ে বড়। পৃথিবীর চেয়ে তেরশত গুণ বড়। শুধু তাই নয়, সব গ্রহগুলির আয়তন একসঙ্গে যত বড় তাহার অপেক্ষা বৃহস্পতির আয়তন আরও বড়। বৃহস্পতিকে খুব উজ্জ্বল দেখায়। সূর্য হইতে বৃহস্পতি আট চল্লিশ কোটি চল্লিশ লক্ষ মাইল দূরে আছে। সূর্যকে একবার ঘুরিয়া আসিতে ইহার বার বছর সময় লাগে।

বৃহস্পতির পর আরও চারিটি গ্রহ আছে; শনি, ইউরেনস, নেপচুন, প্লুটো। সব গ্রহগুলিই সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। শনিও পৃথিবীর চাইতে বড়, সাতশত পঞ্চাশ গুণ বড়। দূরবীনের সাহায্যে ইহাকে খুব সুন্দর দেখায়। একটি বিরাট গোলপিণ্ডকে ঘিরিয়া আছে পর পর তিনটি বলয়।
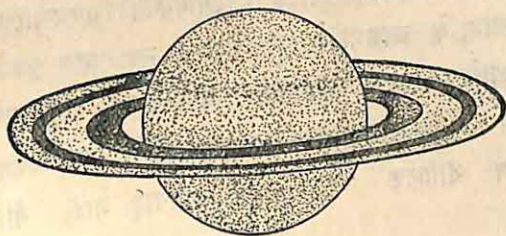
শনি

আকাশে সব চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র দেখিতে দেখিতে মনে হয় ঐগুলি কি এক একটা আমাদের পৃথিবীর মতনই জীবজন্তু, গাছপালা ভর্তি জগৎ? ওখানেও কি আমাদের মতন মানুষ বাস করে?

প্রাণী থাকার সম্ভাবনা কোন গ্রহে থাকিতে পারে ? অবশ্যই যে গ্রহের তাপ, জলবায়ু প্রাণীদের বাঁচিবার আর বৃদ্ধি পাইবার উপযোগী সেখানেই প্রাণী থাকিতে পারে।

সাড়ে তিন শত বছর আগে দূরবীন আবিষ্কার হইল। দূরবীনের সাহায্যে জ্যোতির্বিদেরা আকাশের সব গ্রহ-নক্ষত্রগুলিকে ভাল করিয়া বিভিন্ন সময়ে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। সূর্যের সব চেয়ে কাছে বুধ গ্রহ। সূর্যের তাপ আর আলো পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে। ইহাদের প্রায় সাতগুণ জোরালো তাপ আর আলো সূর্য হইতে বুধে গিয়া পড়ে। বুধের একটা পিঠ সব সময়ে সূর্যের দিকে থাকে। সেদিকটায় এত তাপ যে সেখানে রৌদ্রে সীসা রাখিলে গলিয়া যায়। সেদিকটায় শুধু তাপ নয়, সব সময় আলোও থাকে। আমাদের পৃথিবীর মত সে অংশে দিনরাত হয় না। আবার যে পিঠটা উলটা দিকে আছে সে পিঠে সূর্যের তাপ আর আলো একটুও পোঁছায় না। সেদিকটা খুব ঠাণ্ডা। এত ঠাণ্ডা যে বায়ু শক্ত হইয়া জমাট বাঁধিয়া থাকিতে পারে। সেদিকটা একেবারে অন্ধকার। বুধের মাঝামাঝি জায়গাটা খুব গরমও নয় আর খুব ঠাণ্ডাও নয়। সেখানে প্রাণী থাকার সম্ভাবনা। বুধে কিন্তু বায়ু নাই। একটুও জল নাই। তাই পৃথিবীতে যে সব প্রাণী বাস করে, সে রকম প্রাণী বুধে বাঁচিতে পারে না। জলবায়ু নাই, বাঁচিবে কেমন করিয়া ?

শুক্রগ্রহের কথা কিন্তু আলাদা। শুক্রগ্রহ আয়তনে প্রায় পৃথিবীর সমান। সূর্য হইতে পৃথিবীর প্রায় দ্বিগুণ তাপ আর আলো শুক্রে পৌছায়। ইহাতে এমন অনেক জায়গা আছে সেখানকার তাপ আর আলো আমাদের পৃথিবীর তাপ আর আলোর সমান।

এ গ্রহে কিন্তু জলের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। অক্সিজেন আছে বলিয়াও জানা যায় নাই। প্রাণী শুক্রগ্রহে না থাকা সম্ভব।

মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধে জোতির্বিদদের বড় বেশী কৌতূহল। ভাল দূরবীনের সাহায্যে শীতকালে সেখানে বরফ জমিতে দেখা গিয়াছে। আবার গ্রীষ্মকালে সেই বরফ গলিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে। অনেক-খানি জায়গা জুড়িয়া জল রহিয়াছে মনে হইতেছে। সেগুলিকে বলা হয় মঙ্গল গ্রহের সমুদ্র। পৃথিবীর অপেক্ষা এইটি সূর্যের তাপ আর আলো অনেক কম পায়। এখানেও প্রাণী আছে বলিয়া মনে হয় না।

এক কথায় বলিতে গেলে, সূর্যের কাছের গ্রহগুলিতে তাপ খুব বেশী। দূরের গুলি ঠাণ্ডা। পৃথিবীতে তাপ আর ঠাণ্ডা মাঝামাঝি রকমের। তাহার উপর জীবন ধারণের উপযুক্ত জল আর বায়ু রহিয়াছে, তাই এখানে গাছপালা, পশুপাখী বাঁচিয়া থাকা, বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব হইয়াছে। অন্য অন্য গ্রহে তাহা সম্ভব হয় নাই বলিয়া প্রাণী থাকার চিহ্ন দেখা যায় নাই।

উপগ্রহঃ চাঁদ পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে। অন্য গ্রহদেরও চাঁদের আর কেহ প্রদক্ষিণ করে কি? বড় গ্রহদের প্রদক্ষিণ করে। ছোটদের করে না। চাঁদকে বলে পৃথিবীর উপগ্রহ। মঙ্গলকে দুইটি উপগ্রহ প্রদক্ষিণ করে। বৃহস্পতির এগারটি উপগ্রহ।

নক্ষত্র

সূর্যের মত নক্ষত্ররা নিজেরাই আলো দেয়। গ্রহের আলো স্থির। নক্ষত্ররা মিটমিট করে। সূর্যকে বলিতে পারি খুব বড় একটি নক্ষত্র। পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে এই নক্ষত্রটি আছে। অন্যান্য নক্ষত্রগুলি আরও অনেক দূরে দূরে আছে। সূর্য যে পৃথিবী হইতে

নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ লাইল দূরে। তাহা হইলে অন্য নক্ষত্রগুলি? তাহাদের দূরত্ব প্রকাশ করিতে লক্ষ কোটি মাইলের হিসাবে থই পাওয়া যায় না।

একটা মাপজোখের হিসাবে আসা যাক। ছোট জিনিস মাপিতে বলি এত ইঞ্চি। পেনসিলটা কত বড়, না চার ইঞ্চি। টেবিল মাপিতে হইলে বলি এত ফুট। তখন আর ইঞ্চি বলি না। কত বড় টেবিল, না চার ফুট লম্বা আর তিন ফুট চওড়া। বাড়ি হইতে ডাকঘর কত দূর, তখন আর বলি না, এত ফুট দূর। তখন ব্যবহার করি মাইলের মাপ। কত আর হইবে, এই দেড় মাইল। সূর্য পৃথিবী হইতে কত দূর বলিতে নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল বলা হইয়াছে। কিন্তু অন্য অন্য নক্ষত্রের বেলায় আর সে মাপ চলিল না। তখন নূতন ব্যবস্থা হইল।

আলো-সেকেণ্ড ঃ আলোর বেগ হইল সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। এক জায়গায় একটি আলো জ্বলিল। যেই ঘড়িতে টিকটিক করিয়া এক সেকেণ্ড সময় গেল অমনি সেই আলো গিয়া পৌঁছিল এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল দূরে। এখন যদি বলি কোন জিনিস এক আলো-সেকেণ্ড দূরে রহিয়াছে, তাহা হইলে আমরা কি বুঝিব? জিনিসটি কত মাইল দূরে রহিয়াছে? রহিয়াছে একলক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল দূরে।

নক্ষত্র কত দূরে? চাঁদ পৃথিবী হইতে তুই লক্ষ উনচল্লিশ হাজার মাইল দূরে রহিয়াছে। তাহা হইলে কত আলো-সেকেণ্ড দূরে আছে? অঙ্ক কষিলে দেখা যাইবে মাত্র দেড় আলো-সেকেণ্ড দূরে আছে। আলো-সেকেণ্ড হিসাবে 'মাত্র' বলিলাম বটে, কিন্তু মাইল হিসাবে ত কম দূর নয়। তুই লক্ষ মাইলেরও অনেক বেশী দূর। আচ্ছা, এই নূতন হিসাবে সূর্য পৃথিবী হইতে কত দূরে রহিয়াছে? অঙ্ক

কষিলে পাওয়া যাইবে আট আলো-মিনিট দূরে। তাহা হইলে সূর্য হইতে পৃথিবীতে আলো আসিয়া পৌঁছাইতে আট মিনিট সময় লাগে।

এই নূতন হিসাবে সূর্যের পর পৃথিবীতে সব চেয়ে কাছের নক্ষত্রটি হইল চার-আলো-বছরের কিছু দূরে। আলো বছর কথাটি বুঝিলে? এক বছরে কত সেকেণ্ড? ৩৬৫ দিনকে যদি ২৪ দিয়া গুণ করি তাহা হইলে পাই ৩৬৫ × ২৪ ঘণ্টা। আবার এক ঘণ্টা মানে ৬০ মিনিট। তাহা হইলে এক বছরে ৩৬৫ × ২৪ × ৬০ মিনিট। আর এক মিনিট মানে ৬০ সেকেণ্ড। তাহা হইলে এক বছর অর্থ হইল ৩৬৫ × ২৪ × ৬০ × ৬০ সেকেণ্ড। তাহা হইলে বোঝ ঐ নক্ষত্রটি কত মাইল দূরে। ব্যাপারটা দাঁড়াইল বিস্ময়কর। চার বৎসরের কিছু বেশী আগে যে-আলো নক্ষত্র হইতে বাহির হইয়াছিল, আজ চার বৎসরের কিছু বেশী পরে সেই আলো পৃথিবীতে আসিয়া পৌঁছিল। কোন কোন দূরে-থাকা নক্ষত্র হইতে পৃথিবীতে আলো আসিয়া পৌঁছিতে ৭৫,০০০ বছর সময় লাগে।

ধ্রুব নক্ষত্র ও সপ্তর্ষি মণ্ডলঃ উত্তরদিকে একটি নক্ষত্র
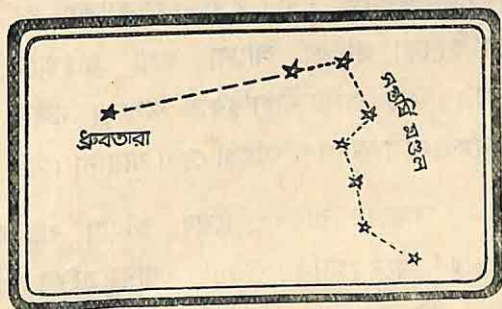
একই জায়গায় স্থির হইয়া থাকে। ইহাকে বলে ধ্রুব নক্ষত্র বা ধ্রুবতারা। রাত্রির অন্ধকারে দিক ভুল করিয়া ফেলিলে এই

ধ্রুব নক্ষত্র দেখিয়া দিক স্থির করা যায়। পৃথিবী হইতে ধ্রুব নক্ষত্র প্রায় সাতচল্লিশ আলো-বছর দূরে আছে। ধ্রুব নক্ষত্রের কাছাকাছি সাতটি নক্ষত্রকে বলা হয় সপ্তর্ষি। ইহারা বেশ জ্বলজ্বলে। ধ্রুব নক্ষত্র ইহাদের তুলনায় একটু ম্লানভাবে জ্বলে। চৈত্র-বৈশাখ মাসে সন্ধ্যার সময় আকাশের উত্তর অংশে সপ্তর্ষিদের দেখা যায়। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাস হইতে সপ্তর্ষি ধীরে ধীরে পশ্চিম দিকে হেলিয়া পড়ে। ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক আর অগ্রহায়ণ মাসে আকাশের একেবারে নীচের নিকে নামিয়া যায়। তখন সন্ধ্যাবেলায় আর দেখা যায় না। পৌষ মাসে আবার উত্তর-পূর্ব কোণ হইতে ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠিয়া আসিতে থাকে।

নক্ষত্র কত বড়? নক্ষত্রগুলি অনেক বড়। তবে অনেক দূরে আছে বলিয়া অত ছোট দেখায়। আকাশে প্রায় চল্লিশ কোটি নক্ষত্র ছড়াইয়া আছে। কোন কোন নক্ষত্র সূর্যের লক্ষ গুণ বড়। কোনটি বা কোটি গুণ বড়। আবার কোনটি বা সূর্যের চাইতে ছোট।

নীহারিকা: আবার দেখা যায়, আকাশের খানিক খানিক জায়গায় যেন ছাবকা ছাবকা আলো লেপা রহিয়াছে। ইহাদের বলে নীহারিকা। এক একটা নীহারিকায় অসংখ্য নক্ষত্র জড় হইয়া রহিয়াছে। নক্ষত্রগুলি আলাদা করিয়া দেখা যায় না।

ছায়াপথ: অন্ধকার রাতে বিশেষ করিয়া শরৎকালে দেখা যায়, আকাশের অনেকখানি জুড়িয়া এধার হইতে ওধার পর্যন্ত অসংখ্য ছোট ছোট আলোর বিন্দু মিলিয়া একটা সাদাপথের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাকে বলে ছায়াপথ। দূরবীন দিয়া দেখিলে বোঝা যায়, অসংখ্য নক্ষত্র মিলিয়া ঐ ছায়াপথ সৃষ্টি হইয়াছে।

সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণঃ সূর্যের দিকে চাহিয়া চোখের কাছে একখানা গোল চাকতি ধরিলে সূর্যকে আর দেখা যায় না। ঐ ভাবে চাঁদের দিকে চাহিয়া চোখের কাছে চাকতি ধরিলে চাঁদও দেখা যায় না। গ্রহণের সময় এই ব্যাপার ঘটে। সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘুরিতেছে, আর পৃথিবীর চারিদিকে চাঁদ ঘুরিতেছে। পৃথিবী আর চাঁদ ঘুরিতে ঘুরিতে সূর্যের সঙ্গে এক সরল রেখায় আসিয়া পড়িল। সূর্য আর পৃথিবীর মাঝখানে চাঁদ। চাঁদ সূর্যের আলো আটকাইল। সূর্য ঢাকিয়া গেল। সূর্যগ্রহণ হইল।
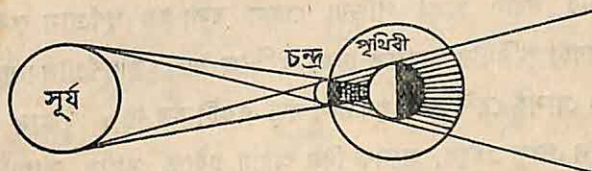
সূর্য গ্রহণ
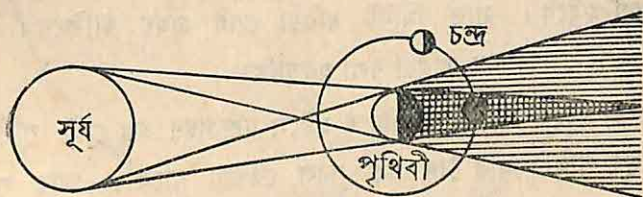
চন্দ্র গ্রহণ

আবার এক সময় ঘুরিতে ঘুরিতে সূর্য আর চাঁদের মাঝখানে পৃথিবী আসিয়া পড়িল। সূর্য পৃথিবী আর চাঁদ এক সরল রেখায় পড়িল, তখন সূর্যের আলো পৃথিবী আটক করিল। পৃথিবীর ছায়া পড়িল চাঁদের উপর। চাঁদের গায়ে আর সূর্যের আলো পড়িল না। চন্দ্রগ্রহণ হইল।

কখন সূর্যগ্রহণ হইবে, কখনই বা চন্দ্রগ্রহণ হইবে? অমাবস্যার সময় সূর্য, চাঁদ আর পৃথিবী পর পর থাকে কিন্তু সকল অমাবস্যায় এক সরল রেখায় থাকে না। যে অমাবস্যায় সূর্য, তারপর চাঁদ তারপর পৃথিবী এক সরল রেখায় আসে, সেই অমাবস্যাতে সূর্যগ্রহণ হয়।

সূর্য পৃথিবী আর চাঁদ পর পর থাকে পূর্ণিমায় সময়। কিন্তু সকল পূর্ণিমায় তাহারা এক সরল রেখায় থাকে না। যে পূর্ণিমায় সূর্য তারপর পৃথিবী তারপর চাঁদ এক সরল রেখায় থাকে, সেই পূর্ণিমাতে চন্দ্রগ্রহণ হয়।

সূর্যের সবটা ঢাকা পড়িয়া গেলে বলা হয় পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ। চাঁদের সবটা পৃথিবীর ছায়াতে ঢাকা পড়িলে বলা হয় পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ। আংশিক গ্রাসই বেশী হয়, পূর্ণগ্রাস বড় একটা হয় না। কোন্ বছরের কোন্ দিন গ্রহণ হইবে, অনেক দিন আগে হইতে মানুষ তাহা হিসাব করিয়া বলিয়া দেয়। ১৯৫৫ সালের ২০শে জুন তারিখে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হইবে। সাত মিনিট ধরিয়া সেই গ্রহণ থাকিবে। ইহা আগে থাকিতে হিসাব করিয়া বলা হইয়াছিল।

তাহা হইলে সংক্ষেপে বলিতে হইলে চন্দ্রগ্রহণ হয় সেই পূর্ণিমায়, যখন সূর্য পৃথিবী আর চাঁদ এক সরল রেখায় থাকে। আর সূর্যের আলো চাঁদে গিয়া পড়িতে পারে না। কেননা পৃথিবী মাঝপথে সেই আলো আটকাইয়া দেয়। পৃথিবীর ছায়া চাঁদের উপর পড়ে।

সূর্যগ্রহণ হয় সেই অমাবস্যায় যখন সূর্য, চাঁদ আর পৃথিবী এক সরল রেখায় থাকে। সূর্যের আলো চাঁদ ঢাকিয়া দেয়। তাই পৃথিবী হইতে আর আমরা সূর্যকে দেখিতে পাই না।
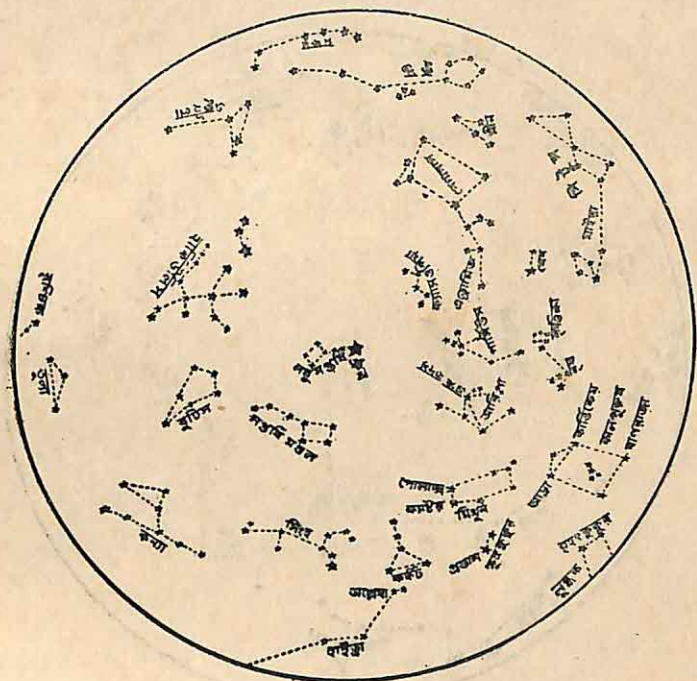
উত্তর আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জ, সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখা যাইতেছে।
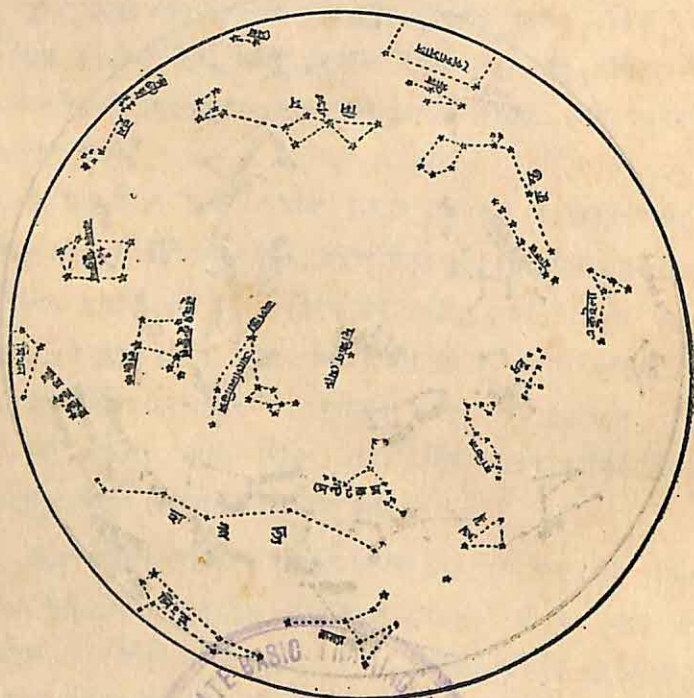
দক্ষিণ আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জ, কালপুরুষ দেখা যাইতেছে।

মূল্য—সাড়ে এগারো আনা